দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

চন্দননগরের দুই বিপ্লবী বন্ধু রাসবিহারী বসু ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষ— পৃঃ ১৭

কবি ও বিপ্লবী হৃদয়ের মহামিলন : রবীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী— পৃঃ ৩৫

৭৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২৫ মে, ২০২৬।। ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

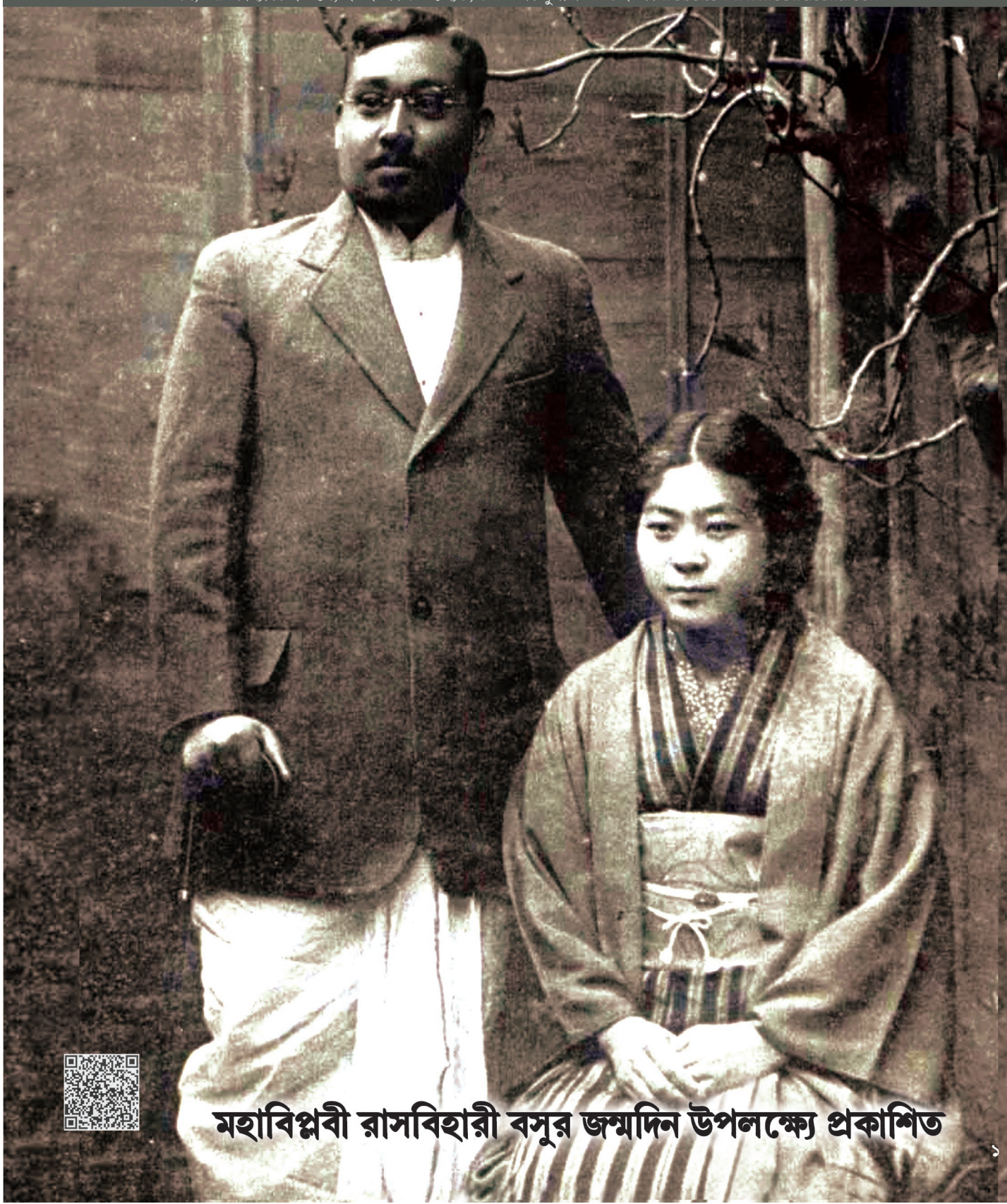

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২৫ মে - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

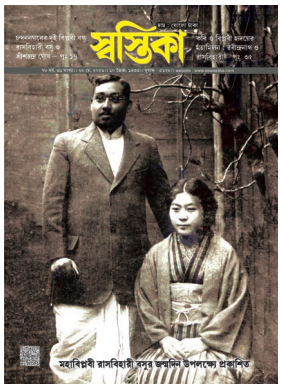

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ইতিহাস সাক্ষী, পরাজিত শাসক এরাজ্যে কখনো ফিরে আসে না : যাহা যায় তাহা যায় □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

তৃণমূল লিগ মার্কসবাদী □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

জাগ্রত জনতার অংশগ্রহণে রাহুমুক্ত বঙ্গভূমি □ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল □ ৮

রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এবার উন্নয়নের পথে চালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ □ কৌটিল্য □ ১০

উত্তরবঙ্গের পথ ধরেই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জাগরণের সূচনা □ বিশ্বজিৎ ঝা □ ১১

বামশাসনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অন্তর্জলি : রাজ্যকে শিল্পবান্ধব করে তোলা নতুন সরকারের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ □ কুণাল চট্টোপাধ্যায় □ ১৩

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এক ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে থাকবে □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৫

চন্দননগরের দুই বিপ্লবী বন্ধু : বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষ □ সৈকত নিয়োগী □ ১৭

পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নবনির্বাচিত সরকার □ ২৩

গান ধরলেন নজরুল—পায়ের কাছে লাঠি রাখে লেঠেল □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩১

অন্ধকার ভেদ করা এক আলোর শিখা সাবিত্রীবাই ফুলে □ বন্দনা বিশ্বাস □ ৩৪

কবি ও বিপ্লবী হৃদয়ের মহামিলন—রবীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী □ সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত □ ৩৫

সবই ঈশ্বরের ইচ্ছে... □ স্বামী যুক্তানন্দ □ ৪৩

রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর ভূমিকা □ সরোজ চক্রবর্তী □ ৪৫

এবারের নির্বাচনে বিজেপির জয় হিন্দুত্বের জয় □ তারক সাহা □ ৪৭

'কালো রাতি গেল ঘুচে...'? □ অমিত দাশ □ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী □ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য : ২২** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □

প্রকাশিত হবে ১ জুন ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১ জুন ২০২৬

মহান দেশপ্রেমিক বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক আপোশহীন বিপ্লবী, সমাজ সংস্কারক এবং হিন্দুত্ব মতাদর্শের প্রবক্তা হলেন বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর। ব্রিটিশ শাসনে তাঁর কর্মকাণ্ড ও দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ ভারতের ইতিহাসের এক স্বর্ণময় অধ্যায়।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই মহান দেশপ্রেমিকের জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের অক্লান্ত যোদ্ধা

ভারতবর্ষের ইতিহাস সতত সংগ্রামের ইতিহাস। অত্যাচারী শাসন অথবা বৈদেশিক আক্রমণ কোনোটিই ভারতের বীর যোদ্ধাগণ সহ্য করেন নাই। গ্রামবাসী-নগরবাসী, বনবাসী-গিরিবাসী, জনজাতি-উপজাতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে বীর বালকের সংখ্যাও কম নহে। মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় তাঁহারাও প্রাণ বলিদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে দীর্ঘ সহস্র বৎসরের বৈদেশিক শাসনকালে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পর্যায়ে সতত সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গ্রিক-শক, তুর্কি- পাঠান ও মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে যেইরূপ ভারতের বীর যোদ্ধাগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তেমনই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধেও মরণপণ সংগ্রাম করিয়াছেন ভারতমাতার অকুতোভয় সন্তানগণ। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাঁহারা মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন ইতিহাস তাহাদিগকে 'বিপ্লবী' অভিধায় ভূষিত করিয়াছে। শত শত বিপ্লবীর আত্মবলিদানে ভারত বৈদেশিক শাসনমুক্ত হইয়াছে। ভারত ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ও সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের পরিসীমা ১৮৫৭ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে বীর সাভারকর প্রমুখ ভারতবর্ষের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ-শাসন বিরোধী শেষ পর্যায়ের সংগ্রামের অগ্রগণ্য ও অদম্য বিপ্লবী হইলেন রাসবিহারী বসু। দিল্লিতে গভর্নর জেনারেল তথা ভাইসরয়ের উপর বোমা নিক্ষেপ করাইয়া সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ভিত তিনি কাঁপাইয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বেই ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করিয়া ২৬টি সেনানিবাসের সৈন্যদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত কৃপাল সিংহ নামক এক সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছিল। স্বদেশে সম্ভব নয় অনুধাবন করিয়া ১৯২৩ সালে তিনি জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করিতে থাকেন। ১৯৪২ সালে তিনি জাপানে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেনস্ লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসী ভারতীয় এবং ব্রিটিশ-ভারতীয় যুদ্ধবন্দি সৈনিকদিগকে লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে তাহার সর্বাধিনায়ক পদে অভিষিক্ত করিয়া চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি একজন আজন্ম যোদ্ধা, তাঁহার আর একটি মাত্র সংগ্রাম অবশিষ্ট রহিয়াছে। আর সেই সংগ্রামই হইবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ এবং চূড়ান্ত সংগ্রাম। তিনি অদম্য যোদ্ধা। ব্রিটিশ শাসক কোনোদিন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। নিশ্চিতভাবেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের লড়াই ছিল তাঁহার সেই চূড়ান্ত লড়াই যাহার অভিঘাতে ব্রিটিশ শাসক ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তিনিই ভারতব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সূচনা করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূতই ছিলেন না, ছিলেন সমগ্র এশিয়ার পরাধীন জাতির মুক্তিদূত। বিদেশের মাটিতে বসিয়া তিনি এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মুক্তি সাধনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয়তার অখণ্ড ধারার একনিষ্ঠ বাহকও ছিলেন। তিনিই জাপানে হিন্দু মহাসভার শাখা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত ও জাপানের মধ্যে তিনি সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের কার্য করিয়াছিলেন। তিনি জাপানিভাষায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ-সহ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবন ও কর্মকাণ্ড পাঠ করিলে শিহরিত হইতে হয়। সত্যিই তিনি যেন রূপকথার কোনো রাজপুত্র। জাপান সরকার এই মহান দেশপ্রেমিককে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'সেকেন্ড অর্ডার অব মেরিট অব দ্য রাইজিং সান' উপাধিতে ভূষিত করিলেও ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের এই মহান যোদ্ধার জন্মভূমি সুবলদহ গ্রাম আজও অবহেলিত। ১৯৬৭ সালে ভারত সরকার তাঁহার স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করিয়াছে মাত্র। ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন যে, এই মহান দেশপ্রেমিকের জন্মভিটাকে কেন্দ্র করিয়া একটি সংগ্রহালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ সংরক্ষিত হউক। পাঠ্যপুস্তকে তাঁহার জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হউক। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহ যে ভারত ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুভাষিতম্

ন হি শৌর্যাৎ পরং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
শূরঃ সর্বং পালয়তি সর্বং শূরে প্রতিষ্ঠিতম্।। (মহাভারত)

অর্থ ঃ ত্রিলোকে পরাক্রমের উপরে কোনো কিছুই নেই। বীর যোদ্ধারাই সকলকে রক্ষা করেন এবং সবকিছুই বীর যোদ্ধাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী পরাজিত শাসক এ রাজ্যে কখনো ফিরে আসে না

যাহা যায় তাহা যায়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

ইতিহাস বলছে, একবার যে শাসক এই রাজ্যের ক্ষমতা থেকে সরে যায় সে ফেরে না। কংগ্রেস আর সিপিএমের মতো তৃণমূল কংগ্রেসের পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। অগ্রবর্তী দুই রাজনৈতিক দলের মতো কিছুদিনের মধ্যে তাদের অফিসেও হয়তো তালা ঝুলে যাবে। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে রাজ্য- রাজনীতিতে দলটি ভোট কাটুয়া হিসেবে থেকে যাবে। কংগ্রেস আর সিপিএমের যখন শেষের শুরু হয় বিধানসভায় তাদের আসন সংখ্যা ১০০-র নীচে নেমে যায়। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে ওই দুই দল পায় ৪৪ (কংগ্রেস) ও ২৬টি (সিপিএম) আসন। ২০২১-এর নির্বাচনে দু'দলের আসন সংখ্যা শূন্য হয়ে যায়। ২০১১-তে বামফ্রন্টের পতনের সময় তাদের সামগ্রিক শক্তি ছিল ৬২। সিপিএমের একার ৪০। সেইবার তারা প্রায় ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছিল । ২০২৬-এর ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস ৪০.৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। সিপিএম পেয়েছে ৪.৪৫ শতাংশ (প্রায় ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ভোট) আর কংগ্রেস ২.৯৭ শতাংশ (প্রায় ১৮ লক্ষ ৯০ হাজার ভোট)। ২০১১-র পরই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল বিদেশি বাম আর কংগ্রেস এ রাজ্যে কোনোদিন ফিরবে না। ১৯৭৭-এ কংগ্রেসের বিপর্যয় সে আভাস দিয়েছিল। ২০১১ থেকে এই দুই দল মার্জিনাল বা 'কিনারার' দল হিসেবেই থেকে গিয়েছে। তৃণমূলের জন্য এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রযোজ্য হবে। তৃণমূল কোনো রাজনৈতিক দল নয়। কেউ তাদের ক্লাব বলত, কেউ-বা বলত গ্যাং বা অসামাজিক গোষ্ঠী। এবারের ভোটে তারা ১০০-র নীচে নেমে গিয়েছে। ২০১১-তে বামফ্রন্ট ২৩৫ থেকে ৬২ আসনে নেমে এসেছিল । তৃণমূলও এবার ২১৫ আসন থেকে ৮০-তে নেমে এসেছে। এত বড়ো পতন যে কোনো দলের পক্ষে চিরকালের জন্য রাজনৈতিকভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

বিজেপি কোনোদিন এ রাজ্যে শাসক ছিল না। ২০১৬-তে বিজেপি তিনটি আসন থেকে শুরু করে দশ বছরের মধ্যে ২০৭টি আসনে পৌঁছে গিয়েছে। ২০২১-এ তারা পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলের তকমা পায়। আর ২০২৬-এ বিজয় রথে চড়ে তারা ক্ষমতা দখল করে। এত কম সময়ে কোনো বিরোধী দল এ রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেনি। এত সত্বর পরিবর্তন রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে দেখা যায়নি। সিপিএমকে সরাতে তৃণমূলের সময় লেগেছিল ১৩ বছর। আর কংগ্রেসকে সরাতে সিপিএমের সময় লেগেছিল প্রায় ২৬ বছর। বিজেপি ৫ বছরের মধ্যেই সেই জয় লাভ করেছে। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা মুখ বাঁচাতে দাবি করছেন যে, তারা পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবেন। এই ধরনের আজগুবি আর উদ্ভট দাবিতে তারা যে অভ্যস্ত রাজ্যের মানুষ তা ভালো জানেন।

গতানুগতিকতার বাইরে গিয়েই বিজেপি রাজ্য শাসন করবে। পশ্চিমবঙ্গে সাত দশক ধরে খাড়া-বড়ি-থোড়-এর সরকার চলছিল। বিজেপি সরকার যে তেমনটা হবে না নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তা বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছেন। অসামাজিক আর জেহাদি তোষণ মিশ্রিত বাঁদুরে বৃত্তি যে বরদাস্ত করা হবে না ইতিমধ্যেই তা জানানো হয়েছে। নবনির্বাচিত সরকারের কয়েকদিনের পদক্ষেপ বিচার করলে সেটাই বোঝা যায়। মুখ্যমন্ত্রী সচেতনভাবে গতানুগতিকতার রাস্তা পরিহার করেছেন। যে বিপুল পরিমাণ ভোট পেয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে তাতে রাজ্যের মানুষের কল্যাণ নিয়ে ভাবনার মস্ত বড়ো সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বের ভাবনায় আর কাজে নতুন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আর সেটাই বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেস-সহ পূর্ববর্তী সব শাসকই তাদের দল আর সরকারকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। দল যা ঠিক করত সরকার তাই বলত। সে ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলেই বিজেপি নেতৃত্ব প্রথম থেকে সতর্ক। তাই রাজ্য বিজেপির নেতারা দলকে বাদ রেখে সরকারকে নিজের মতো করে রাজ্যের ভোটার আর মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর কথা বলতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যেই নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন— যে সরকার তৈরি হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের সরকার। বিজেপি-র সরকার নয়। ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা, অভাব-অভিযোগ শোনা এবং সেগুলির সমাধানের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'জনতার দরবার'। গতানুগতিক ভাবনায় চলা পূর্বতন শাসক বর্তমানে বিরোধী নেতা-নেত্রীরা এ ধরনের মাত্রা বোধ আগে দেখেননি। এই সুস্থ চিন্তা তাদের ছিল না। রাজ্যের এখনকার বিরোধীরা সকলেই কোনো সময় দীর্ঘদিনের শাসক ছিল। তাই বিরোধী হিসেবে দুর্ভাগ্যের রেখা তাদের কপালে যে অজান্তে লেখা হয়ে গিয়েছে তারা তা বুঝতে পারছেন না। বিজেপি থাকতে এসেছে। চলে যেতে নয়। এটা বুঝতে বিরোধীদের যে সময় লাগবে হয়তো ততদিনে তারা উবে যাবেন।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

তৃণমূল লিগ মার্কসবাদী

বহিষ্কৃতেষু দিদি,

আপনাকে এই সম্বোধনটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেয়নি। তারা আপনাকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করেছিল। তার পরে নিয়ম মেনে পদত্যাগ না করায় আপনি শেষে বহিষ্কৃত হয়েছেন। এটা আপনার জীবনের শেষ পরিচয় হয়ে গেল— বহিষ্কৃত মুখ্যমন্ত্রী।

দিদি, এবার আপনি দলের নামটা বদলে ফেলুন। 'তৃণমূল লিগ মার্কসবাদী' নামটা আমার পক্ষ থেকে। প্রথমত দেখুন আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার দলটা মুসলমানদের দ্বারা এবং মুসলমানদের জন্য। যে ক'জন বিধায়ক জিতেছেন তার অর্ধেকই তো মুসলমান। আর তার পরে আপনি যাঁদের নিয়ে জোট করবেন বলছেন সেই সিপিএম নামক জীবাশ্ম একটি আসনে মুসলমানকেই জেতাতে পেরেছে। তাদের সঙ্গী আইএসএফ একই। কংগ্রেসও এক। বিজেপিকে রুখতে এদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চান বলেই জানিয়েছে। এক কথায় আপনার লক্ষ্য দ্বিতীয় মুসলিম লিগ গড়ে তোলা। নেতা সুরাবর্দি ব্যনার্জি। আপনি চিরকাল নিজেকে বামপন্থী বলতে ভালোবেসেছেন, যদিও সেটা খায় না গায়ে মাখে আমি বুঝি না। তাই মার্কসবাদী নামটাও আপনার দলের সঙ্গে থাকুক। এখন থেকেই যে ভাবে শতরূপ, বিকাশরঞ্জনদের নিজের এজেন্ট বানাচ্ছেন তাতে সেটা মন্দও হবে না। আদালতে আপনার পাশে বিকাশ, আবার তিলজলায় আপনার হয়ে শতরূপ। অনেকে তো জীবনে ভোটে না জেতা টিভিতে মুখ দেখানো সর্বস্ব শতরূপকে তিলজলার মুখ্যমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন। আর ভাইপোকে কী করবেন! ডায়মন্ড হারবারের মুখ্যমন্ত্রীও তো করা যাবে না। বেচারা ছোটো থেকে পুলিশের কাঁধে চেপে ঘুরে ঘুরে রাস্তা পার হতেও পারে না। এখন তো জেড ক্যাটাগরি নেই। কী হবে দিদি!

আপনি বিকাশরঞ্জনকে সঠিক বেছেছেন। তিনি আপনার চেয়েও বড়ো সেকুলার। মাকুলারও বলতে পারেন। সবচেয়ে ভালো, মুসলমান বলা। একবার এক সাক্ষাৎকারে সরস্বতী প্রতিমায় ফুল দেওয়াকে ননসেন্স বলেছিলেন। কত বড়ো ননসেন্স একবার ভেবে দেখুন। আবার কাকদ্বীপে যখন কালীমূর্তি ভাঙা হলো, প্রিজন ভ্যানে তুলেছিল আপনার পুলিশ তখন বিকাশরঞ্জন বলেছিলেন, 'কালী তো মাটির মূর্তি, তার আবার মুণ্ডু কীসের?' আমিও তো দিদি এটা বলতেই পারি যে, মুর্শিদাবাদে লেনিনের মূর্তি ভাঙায় অসুবিধা কোথায়! যার দর্শনের কোনো মাথামুণ্ডু নেই সেই লেনিনের আবার মুণ্ডু কীসের!

জাতীয় স্তরে ইন্ডি নামের জোটটার পিণ্ডি চটকে গেছে। এখন রাজ্যে 'তৃণমূল লিগ মার্কসবাদী' নামে ছাতাটা বানিয়ে ফেলুন। অনেক রোদ, ঝড়, বৃষ্টি আসতে চলেছে। ছাতাটা সামলে রাখবেন মনে করে।

না, বলব না। এটা বঙ্গের সংস্কৃতি নয়। আপনি যতই মঞ্চে উঠে কাঁচা খিস্তি করুন, আপনার ভাই হিসেবে আমি কিন্তু বঙ্গসংস্কৃতি মেনেই চলি। এখন অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের নিয়ম বদলের সময় এসেছে। এবার রাস্তায় নমাজের জুলুম শেষ। রেড রোড দখল করে আপনি কি নমাজ পড়তে যাবেন আর! চেষ্টাও করবেন না। বুলডোজার দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ব্রিগেড ময়দান বাছতে পারেন। ওখানে যানজট হবে না।

আপনার সঙ্গে সিপিএমের অনেক মিল। আপনি যে সিপিএমের যোগ্য ছাত্রী তা আমি অনেক আগে থেকেই বলে এসেছি। আপনার মতোই এই ভোটে খালি মুসলমানদের জন্য কেঁদেছে। সাম্প্রতিককালে প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের হামলা থেকে শুরু করে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্থা-সহ যে সব প্রশ্নে সিপিএমকে জোরালো ভাবে পথে নামতে দেখা গিয়েছে, তার সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে 'মুসলমানদের স্বার্থ' জড়িয়ে ছিল। এখন ওরা বুঝেছে হিন্দুদের খুশি করতে হবে। শুনছি, পূজা কমিটি, মন্দির কমিটি, মসজিদ কমিটি বা গির্জা কমিটিতে দলের লোকেদের সম্পৃক্ত হয়ে থাকার চেষ্টা করবে এরা। কোনো ছুতমার্গ রাখা চলবে না। কিন্তু সেটা কি হিন্দুরা হতে দেবে! মনে হয় না দিদি। আপনার ভাইদের পূজাগুলোরও যে কী হবে ভাবছি। আপনার এবং আপনার দলের সঙ্গে হিন্দুদের দূরত্ব কমে গেছে। ক'দিন পরে আর থাকবেই না। তাই আমার দেওয়া নতুন দলের নামটা ভেবে দেখতে পারেন। জাতীয় স্তরে ইন্ডি নামের জোটটার পিণ্ডি চটকে গেছে। এখন রাজ্যে 'তৃণমূল লিগ মার্কসবাদী' নামে ছাতাটা বানিয়ে ফেলুন। অনেক রোদ, ঝড়, বৃষ্টি আসতে চলেছে। ছাতাটা সামলে রাখবেন মনে করে। □

জাগ্রত জনতার অংশগ্রহণে রাহুমুক্ত বঙ্গভূমি

পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে রাহুমুক্ত হলেও মুক্তির সূর্যকে ছায়াবিষ্ট করার চেষ্টার খামতি করবে না অপশক্তি। যেকোনো অছিলায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করবে— অতএব সাধু সাবধান।

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

ফল ঘোষণার পর বিধানসভার মেয়াদও শেষ— তবুও বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জি পদত্যাগ পত্র রাজভবনে পাঠাবেন না— তার হক কথা 'আমি তো হারিনি— পদত্যাগ করবো কেন'? অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জি মনে করেন যে, তার দলের প্রার্থীদের হার-জিৎ নির্ধারণ নির্বাচন কমিশন নয়— তিনি নিজেই করবেন। কৌতুক অভিনেতা রবি ঘোষ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই বলতেন— 'ও মাসি, একথা শুনলে ঘোড়ায়ও হাইসবো'। তিনি নিজে হারলে যে বেসামাল হবেন, একথা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু হেভিওয়েট মন্ত্রীরা যারা তাকে ঘিরে থাকতেন— তারা সকলে এমনকী স্নেহভাজন বালু (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক)-সহ ২৯৪ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় ২১৪ জন হেরে যাওয়ার পরেও মমতা ব্যানার্জি এত হাই ভোল্টেজ পাগলামি করবেন তা অকল্পনীয়। গণতান্ত্রিক দেশে একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল মানতে নারাজ ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং সমর্থকদের দিয়ে U.S. Capitol-এ হামলা চালিয়েছিলেন, সেজন্য অবশ্য তাঁকে শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে।

একই দিনে ভারতের ৫টি রাজ্যে বিধানসভার ভোট ঘোষণা হয়েছে, তার মধ্যে অসম ও পণ্ডিচেরীতে বিজেপি জোটের প্রত্যাবর্তন হয়েছে, আর পরিবর্তন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, কেরলম্ ও তামিলনাড়ুতে। পরাজয় যখন নিশ্চিত হয়েছে, তখনই কেরলমের বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন এবং তামিলনাড়ুর DMK জোটের মুখ্যমন্ত্রী এম.কে. স্টালিন লোকভবনে গিয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন, আর পদত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন মমতা ব্যানার্জি, যদিও তিনি জানেন এ সমস্ত করে তিনি ফিরতে পারলেন না। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, মমতার মতো পোড় খাওয়া একজন রাজনীতিক কেন এত সস্তা নাটক করে তার জন্য পিছনের সারিতে চলে যাওয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখে আর একটু চুনকালি লেপন করলেন? এর উত্তর খুঁজতে হবে মমতা ব্যানার্জির ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনায় এবং সরকারের পিছনের মূলশক্তি প্রোমোটার/সিন্ডিকেট এবং তোলাবাজদের আশ্বস্ত করা— যে আমরা শীঘ্রই ফিরবো, জনগণ আমার পাশেই রয়েছে ইত্যাদি। তার এই নৃত্যনাট্যে সঙ্গত করেছেন রাহুল গান্ধী (অধীর চৌধুরী নন), কেননা তিনি ভাইপোর মতো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত এবং মনে করেন নির্বাচন কনিশন কারচুপি করে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে হারিয়েছে। যদিও কেরলমে সেই একই নির্বাচন কমিশন খুব ভালো কাজ করেছে। এক যুগ পরে সেরাজ্যে ক্ষমতার মুখ দেখেছে কংগ্রেস। রাহুল গান্ধী ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দলের নেতৃত্বে থেকেও মমতা ব্যানার্জির মতো সস্তা রাজনীতির কারবারি বরাবর। এই দুইজনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও তাদের লক্ষ্য এক— সর্বস্ব দিয়েও মুসলমান ভোটব্যাংক রক্ষা করা— কেননা জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা আজ কংগ্রেস- তৃণমূল কংগ্রেসকে এড়িয়ে চলেছে। অসমে কংগ্রেসের ঝুড়িতে যে ১৯টি আসন এসেছে তার মধ্যে ১৮ জনই মুসলমান। পশ্চিমবঙ্গে সর্বসাকুল্যে ২টি আসন পেয়েছে তারা দু'জনই মুসলমান। কেরলমে ১০০টি জেতা আসনের মধ্যে ৩৫ জনই মুসলমান। এই দলটির সাইনবোর্ড পালটে 'Indian National Muslim Congress' রাখার সময় এসেছে— তাই রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশ হোক বা SIR-এর বিরোধিতায় তৃণমূলের সঙ্গে কোরাস গাইতে হবে রাহুলকে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণে রাহুল গান্ধীর তৃণমূল ভজনা বা সমাজবাদী পার্টি নেতা অখিলেশ যাদবের মমতা বন্দনা এবং বিজেপি-কমিশন আঁতাতে ভোট কারচুপির গল্প কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করবেন না, একমাত্র পরাজিতের হতাশা এবং জনরায়কে অস্বীকার করার প্রয়াস ছাড়া। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তিদের পাশে থাকার বার্তায় কোনো রাজনৈতিক ডিভিডেন্ড পাবে না রাহুল-অখিলেশরা। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত হিন্দু ভোট প্রমাণ করে ভবিষ্যতে বাম, কংগ্রেস বা কোনো আঞ্চলিক দলকে ক্ষমতাসীন হতে হলে শুধুমাত্র মুসলমান ভোটব্যাংকে নির্ভরশীল হলে চলবে না— তাই সেকুলার দলগুলির পক্ষ থেকে এই অনৈতিক জোট বার্তা। হিন্দুরা আর হিন্দু পরিচয়ে লজ্জাবোধ করেন না, ভারতের রাজনীতির অধুনা এই বিবর্তন তথাকথিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির জন্য সতর্কবাণী— তা হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে 'হিন্দু-বিরোধিতা' নয়। রাজনীতির এই বাস্তববোধ অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছে— তাঁরা এখন নেহেরুভিয়ান ভাববাদে বিশ্বাস করেন না। সমস্ত পৃথিবীতে এমনকী পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যময় প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে অনুপ্রবেশ, উগ্রপন্থা এবং অভিবাসীদের চাপে প্রকৃত অধিবাসীদের কোণঠাসা হয়ে যাওয়ায় কোনো কোনো দেশের সরকার জেহাদ এবং সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ

হয়ে অভিবাসী আইন পালটাতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতে বেআইনি বাংলাদেশি মুসলমান ও বাংলাদেশ এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল হয়ে রোহিঙ্গা মুসলমান প্রবেশ অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, দাঙ্গা ও দেশবিরোধী কাজে লিপ্ত রয়েছে। এরা অতি সহজেই তৃণমূলের সহযোগিতায় অল্প দিনের মধ্যেই ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করে মুসলমান গরিষ্ঠ এলাকায় থিতু হয় প্রশাসন ও শাসক দলের সহযোগিতায়। এদের গরিষ্ঠাংশ পরিযায়ী শ্রমিকের বেশে বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মুম্বই বা চেন্নাইয়ের মতো বড়ো শহরে কাজের খোঁজে জড়ো হয় এবং বিভিন্ন এজেন্ট মারফত বড়ো শহরগুলির মুসলমান অধ্যুষিত বস্তিতে ঘর নেয় বাঙ্গালি পরিচয়ে। রোহিঙ্গারা যারা বাংলাদেশে কয়েক বছর কাটিয়ে এসেছে তারাও বাঙ্গালি মুসলমান পরিচয় দিচ্ছে, তবে তাদের শনাক্ত করা কঠিন কোনো কাজ নয়।

এখন দেখার নতুন বিজেপি সরকার বা ভারত সরকার প্রতিশ্রুতি অনুসারে অনুপ্রবেশকারী হঠানোর বিষয়টি কীভাবে সামলাবে— অর্থাৎ course correction-এর কি ব্যবস্থা হয়। লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী কয়েক দশক ধরে যে শিকড় ছড়িয়েছে তা উৎপাটন করা কি সম্ভব হবে— নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাই বলুন? পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকার আসায় বাংলাদেশ আতঙ্কিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খলিলুর রহমান জানিয়েছেন--- তারা বাংলাদেশে push in মেনে নেবে না। জবাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রক বলেছে— বেআইনি অভিবাসীদের চিহ্নিত করে দেশে ফেরত পাঠানো ভারতের স্থায়ী নীতি, এ বিষয়ে ভারত কোনো সমঝোতা করবে না। খলিলুর যাই বলুন, লক্ষ লক্ষ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে যুগের পর যুগ ধরে পোষা সম্ভব নয় এবং রাষ্ট্রহিতে বাঞ্ছনীয় নয়— কারণ ইতিমধ্যেই এদের একাংশের দেশবিরোধী কাজে— বিশেষত প্রাণঘাতী বিস্ফোরণ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যোগে প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে, যা জাতীয় নিরাপত্তা এবং দেশের অখণ্ডতার প্রতি বিপদ স্বরূপ।

চারটি দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা থাকায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ভূ-রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ফলে অনুপ্রবেশ সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে আর্থ-সামাজিক সমস্যা ছাপিয়ে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জটিলতার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন এর আশু সমাধান দরকার— কিন্তু কোন পথে? SIR সমস্যার অভিমুখটি নির্দেশ করছে কিন্তু সমাধান করতে হবে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে। অসমের মতো NRC (National Register of Citizens) করতে গেলে পশ্চিমবঙ্গে তা তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হবে— তবে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে Double Engine সরকার পথ দেখাতে পারে। যাদের এনআরসি-তে যাদের নাম বাদ যাবে (মনে করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম থাকবে না) তাদের স্টেটাস কী হবে? তাদের কি Foreigner হিসেবে গণ্য করা হবে— না অসমের মতো ডি-ভোটার ক্যাটেগরিতে পড়বে। বাংলাদেশ তাদের গ্রহণ করতে না চাইলে এদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো ছাড়া বিকল্প থাকবে না এবং তাদের পুষতে কোটি কোটি টাকা খরচ হবে। এদের ক্যাম্পে রেখে বংশ বৃদ্ধিতে কার লাভ হবে— যদি না এদের উন্নয়নমূলক কাজে শামিল করা যায়। এদের চিহ্নিত করে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া একটা সমাধান হতে পারে, যাতে এরা ভারতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে না পারে।

অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন ছাড়াও, নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়া আইন-শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধার, তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ নির্মূল করা এবং দুর্নীতি দমন ও পরিকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা, যাতে অদূর ভবিষ্যতে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান হয়। সরকার তার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করবে, তবে পরিবর্তনের প্রভাব যেন সমাজজীবন স্পর্শ করে, যাতে দেশবিরোধী এবং সন্ত্রাসী শক্তি মাথা তোলার সাহস না দেখাতে পারে। মমতা ব্যানার্জি যতই এই জনাদেশ মানেন না বলে আস্ফালন করুন তিনি জানেন তিনি ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত ছেড়া কাগজের মতো এবং শুভেন্দু অধিকারী আজ বাঙ্গালি হৃদয় সম্রাট। আর গুজব ছড়িয়ে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত, চাকুরিজীবী এবং আলোকিত অংশকে উত্তেজিত করা বা বিভ্রান্ত করা যাবে না। বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বা মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদের আগলে রাখতে তাঁরা কেন বৃহত্তর বাঙ্গালি সমাজের বিরাগভাজন হবেন? ভারতীয় মুসলমানদের ভারতের হিতে কাজ করতে হবে, কারণ তাদের এখানেই থাকতে হবে--- কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে যেতে চাইবেন না।

তৃণমূলের সর্বত্রগামী দুর্নীতি, সীমাহীন ঔদ্ধত্য এবং অত্যাচার, রাজনৈতিক তথা সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চনা, প্রিয়জন হারানোর বেদনা বুকে চেপে রেখে বাঁচার দীর্ঘ প্রতিক্ষার পরে রাজ্যবাসী আজ তৃপ্ত, গর্বিত--- নবযুগের আবাহনে খুশিতে আপ্লুত। গরিব আটপৌরে মহিলা, কৃষক, দিনমজুর থেকে চাকুরিজীবী নিম্ন মধ্যবিত্ত, এমনকী উচ্চ মধ্যবিত্তের মানুজন প্রকাশ্যে এসে ভোট দেওয়ায় এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। বিগত তৃণমূল শাসনে যে শুধু ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয়েছে তাই নয়, ভোটে ব্যাপক কারচুপি করে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করা হয়েছে— ভবিষ্যতে যাতে এ জিনিস না হয় তার প্রতি আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে সরকার ও জনসধারণকে সাবধান থাকতে হবে যাতে ফিনিক্স পাখির মতো ওরা ফিরে আসতে না পারে। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে রাহুমুক্ত হলেও মুক্তির সূর্যকে ছায়াবিষ্ট করার চেষ্টার খামতি করবে না অপশক্তি। যেকোনো অছিলায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করবে— অতএব সাধু সাবধান।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এবার উন্নয়নের পথে চালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে 'পরিবর্তন'-এর প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে অনেকেই ১৯৭৭-এর বিষয়ে বলেন। এরপর রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রে আলোচিত হয় ২০১১ ও ২০২৬। মাঝে দু'টি স্বল্পমেয়াদের যুক্তফ্রন্ট সরকার বাদ দিলে স্বাধীনতার পর প্রায় ২৬ বছরের শাসনকাল ছিল কংগ্রেসের। ১৯৭৭ সালে এ রাজ্যে চিরতরে বিদায় নেয় কংগ্রেস। কিন্তু ১৯৭৭-এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো ১৯৬৬। কেন ১৯৬৬-র রেফারেন্সের অবতারণা সেই বিষয়ে এবার আলোচনা করা যাক। প্ল্যানিং কমিশন তাদের 'তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'য় (১৯৬১-১৯৬৬) কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে যে, দেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রয়োজন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তখন কার্যত রাশিয়ার (পড়ুন— কেজিবি-র) হাতের পুতুল। তার তখন একটাই লক্ষ্য। কংগ্রেস দলকে অতুল্য ঘোষ ও কামরাজ-মুক্ত করতে হবে। তাই পশ্চিমবঙ্গে ও তামিলনাড়ুতে নিজের দলকে হারানোর পরিকল্পনা করলেন তিনি। তৈরি হলো 'বাংলা কংগ্রেস'। অজয় মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং গনি খানকে কাজে লাগিয়ে নিজের দলের ভোট কেটে ফেলে দিলেন নিজের (কংগ্রেসের) সরকার। অতুল্য ঘোষ রাজনীতি ছাড়লেন এবং এরপর প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯৭৫-এ সোশ্যালিস্ট পার্টি ও ভারতীয় জনসঙ্ঘের সঙ্গে একজোটে গঠন করলেন জনতা পার্টি। পশ্চিমবঙ্গে সেই নবগঠিত জনতা পার্টির প্রধান হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

স্বাধীনতা লাভের পরও দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের অর্থনীতি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল— কলকাতা। সাহিত্যিক শঙ্কর, রমাপদ চৌধুরী ও বাণী বসুর রচিত উপন্যাস পড়লে জানা যায় যে, ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত এ রাজ্যে স্নাতকদের কী ভয়ংকর অবস্থা ছিল। এরপর শুরু হয় একে একে ব্যাংক, কয়লাখনি ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থার জাতীয়করণ এবং বামপন্থী নৈরাজ্য জাঁকিয়ে বসতে থাকায় ধীরে ধীরে সূচিত হয় কলকাতার সর্বনাশ। তার আগে 'কলকাতা' ছিল দেশের সবচেয়ে বড়ো অর্থকেন্দ্র। ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে মাওবাদীদের দ্বারা সিপিআই(এম-এল) গঠন, আবার ওই বছরই কংগ্রেস ভেঙে ইন্দিরা গান্ধীর বেরিয়ে এসে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন, তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় নীতির প্রয়োগে ব্যাংক ও বিভিন্ন শিল্প সংস্থার জাতীয়করণ এবং বাংলা কংগ্রেসের যুবদের দলে দলে ইন্দিরা গান্ধীর নতুন দলে যোগদানের সাক্ষী থাকে ইতিহাস। ইন্দিরা গান্ধী নেতিবাচক বাঙ্গালিদের ভীষণ পছন্দ করতেন। যেমন— অশোক মিত্র, অর্জুন সেনগুপ্ত, অমর্ত্য সেন, প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এরপর বিদেশ থেকে পিএইচডি করা তিন অর্থমন্ত্রী (অশোক মিত্র, অসীম দাশগুপ্ত ও অমিত মিত্র) এবং দুই নোবেল লরিয়েট (অমর্ত্য সেন ও অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়)— 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহার শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গকে। এর পরিণামে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি হলো শেষ। তবে এরা ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে তাকে এগিয়ে নিয়ে গেলেও কফিনে শেষ পেরেকটা হয়তো মারতে পারেননি। যারা এ রাজ্যের অর্থনীতির সবচেয়ে বড়ো সর্বনাশ করেছেন, তারা হলেন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। 'দাস ক্যাপিটাল'-এর লেখক বেঁচে থাকলে সম্ভবত বলতেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ওর থেকেও বড়ো সমাজতান্ত্রিক!

সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন অর্থসচিব, মুখ্যসচিব এবং অবসরগ্রহণের পর মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টার দায়িত্বভার সামলানো ব্যক্তির জমানা এখন শেষ। ১৯৬৬ থেকে অপেক্ষা করার পর রাজ্যে এবার এল প্রকৃত 'পরিবর্তন'। ৬০ বছর পর পশ্চিমবঙ্গে যেন ভালো সময় আসছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. অশোক কুমার লাহিড়ী ইতিমধ্যেই 'নীতি আয়োগ'-এর ভাইস-চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল এরাজ্যের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে আসতে পারেন বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। এরকম ইতিবাচক মানসিকতা-সম্পন্ন অর্থনীতিবিদরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে থাকবেন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত আজ হিন্দুত্বের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গঙ্গাসাগর-সহ এবার এই পুরো ভূখণ্ডকে সারা পৃথিবীর কাছে নিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতার পর ৬০ বছরের কেন্দ্রীয় শাসনে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে তৈরি হয় অর্থনৈতিক অসাম্য। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অসাম্য দূর করতে পারে একমাত্র 'পশ্চিমবঙ্গ'। ভবিষ্যতে সেই দিনটি আসছে খুব শীঘ্রই। মেধাসম্পন্ন বাঙ্গালি গত ৫০ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়েছে। কর্মসংস্থানের অভাবে এরাজ্যের দক্ষ শ্রমিকরাও হয়েছে পরিযায়ী। এবার ধীরে ধীরে এরাজ্যের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত বাঙ্গালি ছেলে-মেয়েদের আগামী ৫-৭ বছরের মধ্যে স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার লক্ষ্যে প্রস্তুতিগ্রহণ প্রয়োজন।

তবে কিছুটা ঝুঁকি রয়েছে। একদল পরিবেশবিদ, আইনজীবী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী গা গরম করতে শুরু করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং বাজারি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উত্তর-সম্পাদকীয়গুলো দেখলেই তা বোঝা যায়। আগামীদিনে এরাজ্যে যেকোনো পরিকাঠামো-উন্নয়ন প্রকল্প ও শিল্পোদ্যোগ আটকাতে সিঙ্গুর ও গ্রেট নিকোবর মডেলে মাঠেঘাটে ও আদালতে নানারকম প্যাঁচ কষতে চলেছে বাম-অতিবাম-জেহাদি ইকোসিস্টেম। উন্নয়নকে স্তব্ধ করে রাজ্যকে অশান্ত করার লক্ষ্যে নানারকম ভয়ংকর পদ্ধতি তারা অবলম্বন করতে পারে। তবে এবার পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুত। সব বাধা পেরিয়ে সার্বিক উন্নয়নের গতিপথে এবার চালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ। দেশের উন্নয়নের মানচিত্রে অচিরেই স্থান করে নিতে চলেছে এরাজ্য।

উত্তরবঙ্গের পথ ধরেই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জাগরণের সূচনা

বিশ্বজিৎ ঝা

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই অভূতপূর্ব জয় শুধুমাত্র হিন্দুত্বের জয় নয়, বরং এটিকে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির উত্থান বলাই যুক্তিযুক্ত। এই জয় শুধুমাত্র কোনো একটি রাজনৈতিক দলের জয় নয়, এ যেন বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্তি। তৃণমূল যদি এবারে নির্বাচনে জয়লাভ করতো তাহলে বাঙ্গালি হিন্দুকে হয়তো পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে উদ্বাস্তু হতে হতো আরেকবার। ভারতীয় জনতা পার্টির এই বিপুল জয়ের মাধ্যমে বাঙ্গালি হিন্দুরা ইসলামীকরণের হাত থেকে রক্ষা পেল। নাহলে, পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের যে পরিণতি, সেই পরিণতি অপেক্ষা করছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের ভাগ্যে। বিজেপিকে জেতাবার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালি হিন্দুরা একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রকে আপাতত রুখে দিতে সক্ষম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশে পরিণত করা হলো সেই ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনার একটি অংশবিশেষ।

বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ জয়ে উত্তরবঙ্গবাসীর অগ্রণী ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল এবং তার পাদদেশ নিয়ে গঠিত উত্তরবঙ্গে মোট আটটি জেলা রয়েছে--- কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ। এই অঞ্চলের হিন্দুদের সংহতি ও তাদের বিজেপির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ৫৪টির মধ্যে ৪০টি বিধানসভা আসন এই দলকে উপহার দিয়েছে। যদিও উত্তরবঙ্গবাসী যে বিজেপির প্রতি তাদের সমর্থন এই প্রথমবার দিয়েছে তা নয়। উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী হিন্দুদের একতার কারণেই ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মোট আটটির মধ্যে সাতটি আসনে জয়লাভ করেছিল। যার ফলে বিজেপি সেবার পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৮ টি আসন জিততে সমর্থ হয়েছিল। এমনকী, ২০২১ সালেও সারা রাজ্যে বিজেপির আশানুরূপ ফল না হওয়ার মধ্যেও উত্তরবঙ্গ বিজেপির দিক থেকে সেভাবে মুখ ফেরায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল বিজয়ের মধ্যে বিজেপি যে তিনটি মাত্র আসন জিততে সক্ষম হয়েছিল তার মধ্যে দু'টি এসেছিল উত্তরবঙ্গ থেকে, আরেকটি বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ খড়্গপুর সদর থেকে জিতেছিলেন।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসেছিল ২০১১ সালে। মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সেই পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে তারা উপহার পেয়েছে একটা বহুস্তরীয় দুর্নীতিগ্রস্ত, জেহাদি তোষণকারী, স্বৈরাচারী সরকার। যারা দিনের পর দিন মানুষকে বিশেষত হিন্দুদের ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। একদিকে যেমন হিন্দুরা তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে, অপরদিকে মুসলমানদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে। ওয়াকফ বা নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও হিন্দু নিধন হয়েছে মুর্শিদাবাদ, মালদা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলায়। শেখ শাজাহান, জাহাঙ্গির, শওকত মোল্লাদের মতো কুখ্যাত জেহাদি-দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা তো কখনো করা হয়নি বরং এদেরকে ভোটের সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করেছে মমতা ব্যানার্জির ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জি।

> **উত্তরবঙ্গ আর রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক বা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির মধ্যে বিবেচিত হবে না, বরং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কেন্দ্র রূপেই পরিগণিত হবে।**

পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজ কোনোদিন এইসব অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করেনি। তথাকথিত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কিছু পদ বা সুবিধার বিনিময়ে এই ধরনের স্বৈরাচারী দেশবিরোধী শক্তিকে সমর্থন করে এসেছেন। তারা পদে পদে এরাজ্যের মানুষকে ভুল বুঝিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন যে তৃণমূল চলে গেলে পশ্চিমবঙ্গে যদি বিজেপির উত্থান হয় তাহলে বাঙ্গালির কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বাঙ্গালি অস্মিতা, আত্মমর্যাদা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন মুখ বুজে তৃণমূলি গুন্ডাদের অত্যাচার সহ্য করে গিয়েছে।

পক্ষান্তরে, উত্তরবঙ্গে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সংখ্যা কম। কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এদের প্রভাব অনেকটাই বেশি। বাঙ্গালিয়ানার মুখোশের আড়ালে এরা ঘুরিয়ে এক প্রকার হিন্দুদের বিরোধিতা করেছে। এমনকী পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে জঘন্য নির্মম অত্যাচারেও এরা মুখ খোলেনি। তৃণমূলনেত্রীও নিজের সুবিধার্থে এই ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীকে মাথায় তুলে

ফঃ ২

রেখেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এরাজ্যের জেহাদি মুসলমানরা। যার ফলে, মমতা ব্যানার্জির দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটব্যাংকের সমর্থন ভোগ করে এসেছে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে।

ভৌগোলিক অবস্থান, নিজেদের জাতিসত্তা বজায় রাখা এবং আগামী বিপদের বিষয়ে সতর্ক থেকেছে উত্তরবঙ্গবাসী। উত্তরবঙ্গের হিন্দুরা জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে ইসলামিক জেহাদিদের বিরুদ্ধে ঐকমত্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদেরকে রাজবংশী, জনজাতি, মতুয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জাতি-উপজাতিতে বিচ্ছিন্ন করার ঘৃণ্য চক্রান্তকে তারা ভেঙে দিয়েছে। তাঁরা বৃহত্তর হিন্দু জাতি হিসেবে সংগঠিতভাবে বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছে পরপর বিগত বেশ কয়েকটি নির্বাচনে। এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার তা হলো অসমের সঙ্গে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য তাদেরকে এই পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করেছে, কারণ উত্তরবঙ্গও অসমের মতো একইভাবে মুসলমান অনুপ্রবেশে জর্জরিত।

দীর্ঘ ৩৪ বছর বাম শাসনের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জানানো সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গবাসীকে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারও উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রতি উদাসীন ছিল, আর তৃণমূল কংগ্রেস দলটি তো কলকাতার আরও বিশদভাবে বললে দক্ষিণ কলকাতার একটি অঞ্চলের মানুষ দ্বারাই পরিচালিত হতো। তাই এই অপশাসনে উত্তরবঙ্গবাসীর বঞ্চনা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা বলাই বাহুল্য। নবান্নের একটি শাখা হিসেবে 'উত্তরকন্যা' নামের ক্ষুদ্র সচিবালয়টি শুধুমাত্র 'লোক দেখানো' উন্নয়ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বছরের পর বছর উত্তরবঙ্গের মানুষকে যে উচ্চশিক্ষার জন্য বা উন্নততর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাড়ি দিতে হতো সেই ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।

তৃণমূলের আমলে সুন্দর আবহাওয়া ও উপযুক্ত ভৌগোলিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গ কখনোই শিল্পাঞ্চল হিসেবে মর্যাদা বা গুরুত্ব পায়নি। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী বা উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী হিসেবে শিলিগুড়িকে বলাই যায়। এই শিলিগুড়ি তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা ও চিকিৎসার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠতেই পারতো, কিন্তু তৃণমূল সরকারের অবহেলা ও উদাসীনতার কারণে তা হয়ে ওঠেনি। যে দার্জিলিং ব্রিটিশ আমল থেকে সারা বিশ্বের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র ছিল তা তার গৌরব ধীরে ধীরে হারিয়েছে। দার্জিলিং-সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলকে পর্যটনের জন্য অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তোলা যেত। সেই উদ্দেশ্যে যে সঠিক পরিকল্পনা নেওয়ার দরকার ছিল তা কখনোই নেওয়া হয়নি। তাছাড়া উপযুক্ত পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবও পরিলক্ষিত হয়ে এসেছে বহু বছর যাবৎ।

মূলত কলকাতা- নিবাসীদের অংশীদারিত্বে পরিচালিত মমতা ব্যানার্জি সরকার কখনোই গোর্খাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সফল হতে পারেনি। একই কথা প্রযোজ্য কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি-নিবাসী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের ক্ষেত্রেও। এই কারণেই বারে বারে উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিও জোরদার হয়ে উঠেছে । পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানের অভাব বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানগুলো (উল্লেখ্য, অনেকগুলি চা বাগান এই সময় কালের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছে) থেকেই সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছেন।

দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত এই অঞ্চলের জনগণের সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ভারতীয় জনতা পার্টিই প্রথম বুঝতে চেষ্টা করে। কোচবিহারের তৎকালীন সাংসদ নিশীথ প্রামাণিককে দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের আমলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজবংশী সম্প্রদায়ের জননেতা নগেন্দ্র রায় (অনন্ত মহারাজ)-কে রাজ্যসভার সাংসদ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন করেছে। কোচবিহার থেকে বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কোচবিহার থেকে রাজধানী দিল্লি যাওয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন চালু করেছে। শুধু কোচবিহার নয়, উত্তরবঙ্গের সবক'টি জেলাকেই রেলের মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে সচেষ্ট হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার।

জাতীয় সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের পর থেকে বাংলাদেশে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছিল। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস চিকেন'স্ নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর (৬০ কিলোমিটার লম্বা ও ২২ কিলোমিটার চওড়া)-কে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার হুমকি দিয়েছিল, যার ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিঘ্নিত হওয়ার এবং ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলো মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, ভুটান, নেপাল ও চীনের সীমানা সংলগ্ন হওয়ার জন্য জাতীয় সুরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতেও এই অঞ্চলের গুরুত্ব বিজেপির মতো জাতীয়তাবাদী শক্তি তথা ভারত সরকারের কাছে অপরিসীম ছিল। সেই সঙ্গে বিজেপি এটাও অনুভব করেছিল যে শুধু সুরক্ষা নয়, উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে থাকা এই অঞ্চলে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস্ বা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মতো কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলা খুব জরুরি।

বিজেপির উত্থানে রাষ্ট্রভক্ত মানুষদের ভূমিকাও অপরিসীম। স্বাধীনতার পর থেকেই সত্যনিষ্ঠ, দেশের জন্য নিজেদের উৎসর্গীকৃত সঙ্ঘের কার্যকর্তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন এই মহৎ উদ্দেশ্যে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নেতৃত্বে সীমান্ত চেতনা মঞ্চও এখানে অবিরাম কাজ করে গিয়েছে। তাছাড়া, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভূমিকাও এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও বিদ্যাভারতীর অধীনে গড়ে ওঠা বিদ্যালয়গুলির অবিরাম প্রয়াসের ফলে এখানে জনমানসে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উত্তরবঙ্গ আর রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক বা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির মধ্যে বিবেচিত হবে না, বরং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কেন্দ্র রূপেই পরিগণিত হবে। ◻

বাম শাসনে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অন্তর্জলি

রাজ্যকে শিল্পবান্ধব করে তোলা নতুন সরকারের কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

অনেকেই গত পনেরো বছরের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালকে বাম শাসনেরই সম্প্রসারিত রূপ বলে থাকেন। সেই হিসেবে এই লেখাটিকে গত পঞ্চাশ বছরে এই রাজ্যের শিল্পশূন্য হওয়ার ব্যবচ্ছেদ মনে করা যেতে পারে।

এখানে পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এবং প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৮৫৭) এই একশো বছর সময়কালে পশ্চিমে সুরাট-মুম্বাই উপকূলে এবং পুবে কলকাতায় আধুনিক শিল্প প্রচেষ্টা যেটুকু হয়েছিল তার কুশীলবেরা ছিলেন মূলত পার্শি, ইহুদি, সিন্ধি পরিবার এবং এক ও অদ্বিতীয় বাঙ্গালি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। মাড়োয়ারিদের আগমন কিছু পরে।

সালটা ১৮৩৬। দ্বারকানাথ ইংরেজ এজেন্সি হাউস আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানির থেকে রানিগঞ্জ কোলিয়ারি কিনলেন। শুরু করলেন গুনটানা নৌকায় কলকাতা থেকে গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত পণ্য পরিবহণ। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত স্টিমার সার্ভিস। আকরিক কয়লা পরিবহণের জন্য বার্জ ব্যবস্থা। রানিগঞ্জ থেকে ১৬০ কিলোমিটার রেলপথ বসানোর জন্য তিনি রানির অনুমতি চাইলেন। কিন্তু এই ইচ্ছাকে লাইনচ্যুত করল ইংরেজ। রানিগঞ্জে প্রিন্সের বানানো অট্টালিকাটি দেখার সৌভাগ্য এই প্রতিবেদকের হয়েছে। কথায় আছে— 'Spiders hang her tapestry in the palaces of the Caesar's.'

বঙ্গভঙ্গ ও বাঙ্গালির শিল্পোদ্যোগ ঃ বঙ্গভঙ্গের সত্তর বছর আগে এই বঙ্গে দ্বারকানাথ বহুমুখী শিল্পোদ্যোগের যে রাজপথ গড়ে গিয়েছিলেন সেই পথে না হেঁটে তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচিন্তক মহর্ষি এবং পরে জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হলে ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ হতো না। হিন্দু জমিদারদের বাধা ও বঙ্গের আবেগকে কাজে লাগিয়ে নাখোদা মসজিদের ইমামকে রাখি পরাতে পারলেও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার বদলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার অস্ত্রটি সেদিন তুলে দেওয়া হয়েছিল ইংরেজের হাতে। তার ফল ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন। এটা ছিল পাখির মুখে গাজর ধরার মতো। খেলে ও হজম করলে নতুন গাজর দেওয়া হবে। কবি

হোপ ৮৬-র সময় থেকে দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলির বিলয় ঘটার পর হকার, ব্রোকার, অটোচালক ছাড়া যে ক্লাব নির্ভরতা এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে সেখানে এহেন বন্ধ্যা শিল্প মানচিত্রে কোনো বিনিয়োগকারীই এগিয়ে আসবে না। নূতন যুগের ভোরে এই রাজ্যকে শিল্পবান্ধব প্রমাণ করাই নতুন সরকারের কাছে সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে তীব্র সমালোচনা করলেও গান্ধী এই আইনের পক্ষে ছিলেন। গান্ধীর অনেক 'ইচ্ছাকৃত' ভুল সিদ্ধান্তের মতো এটাও হয়েছিল ইংরেজকে শক্তি জোগানোর হাতিয়ার।

বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া যে স্বাদেশিকতার জোয়ার এসেছিল তার ফলে বাঙ্গালি ধনীরা, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের এক শ্রেণির জমিদার তাদের সন্তানদের বিলেত ফেরত প্রযুক্তিবিদ ও উদ্যোগপতি বানালেন। আবার এমনই অনেক জমিদারনন্দন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবসার পরিবর্তে সাহিত্য, আইন ও অধ্যাপনায় গিয়ে 'মেড ইন ইংল্যান্ড' কমিউনিস্ট হয়ে কেবল আইনসভা আলো করলেন না, পুঁজিবাদের নামে প্রবল পুঁজি বিরোধী হয়ে প্রথমোক্ত উদ্যোগপতিদের মূলধন গঠনের প্রয়াসে জল ঢাললেন। এক থলিতে মাছ আর ফুল রাখলে মাছে ফুলের গন্ধের পরিবর্তে ফুলে মাছের গন্ধ হয়। মাত্র পনেরো বছরে বার্নপুর ইস্কোকে দেশের মানচিত্রে সম্মানের আসনে বসিয়েও পুঁজি বিরোধীদের সমর্থন তিনি পাননি।

ঢাকার নরসিংদা পরিবারের তিন সন্তান সুরেন, হেমেন, কিরণ গড়ে তুলেছিলেন বেঙ্গল ল্যাম্প। সুরেন ও হেমেন জার্মানি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিঙে ডিগ্রি নিয়ে পরে যাদবপুরে অধ্যাপনাও করেন। ১৯৭০ সালে বেঙ্গল ল্যাম্প বেঙ্গালুরুতে শাখা বিস্তার করে। তৈরি করে কিরণ ল্যাম্প এবং সেই বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারিতে জ্যোতিবাবুর জড়িয়ে পড়া, যতীন চক্রবর্তীর কন্যার রহস্যমৃত্যু— সব ইতিহাস।

১৯০৫ সালে এফএন গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত ঝর্ণা ফাউন্টেন পেন, ১৯৩৪-এ রাজশাহীর ননীগোপাল ও শঙ্করাচার্য মৈত্রের প্রতিষ্ঠিত সুলেখা ও বন্দে মাতরম্ ম্যাচ ফ্যাক্টরি, কৃষ্ণা

গ্লাস, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি একদা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। এই প্রসঙ্গে কুষ্টিয়ার মোহিনীমোহন চক্রবর্তীর মোহিনী মিল কুষ্টিয়া ছাড়িয়ে শ্যামনগর ও বেলঘড়িয়াতেও সাম্রাজ্য বিস্তার করে। আজ সব ইতিহাস।

ব্যাংকিং শিল্পে ইউনাইটেড ব্যাংক, পিয়ারলেস এমনই গর্বের ইতিহাস। এমনকী গবেষণার ক্ষেত্রেও অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও একদা নিজের প্রতিষ্ঠান ফেলে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে ঘর নিয়ে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জ্যোতি বসুর সাহায্য চেয়েও তিনি পাননি। আজ সেই প্রতিষ্ঠানের 'গর্ব' গর্গ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় শিল্পের মৃত্যু বিনোদন ও লক্ষ্মীর চাঞ্চল্য ঃ

কলকাতার বাবু চূড়ামণি দত্তকে অন্তর্জলি যাত্রায় বের করা হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় থেকেও আয়োজক তিনি। তাঁর অনুচরেরা গান ধরেছে—
'আয় রে আয় নগরবাসী
দেখবি যদি আয়
জগৎ জিনিয়া চূড়া
যম জিনিতে যায়।' তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী সদ্য প্রয়াত রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়ির সামনে আসতেই অনুচরেরা ঢাকের বোলে আরও জোরে গেয়ে উঠলো— 'চূড়া যম জিনিতে যায়।'

স্বাধীনতার দু'দশক পরে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে একটা ধারণা দানা বাঁধে— বাঙ্গালি মেধাগত সৃষ্টিশীলতায় অদ্বিতীয় হলেও ব্যবসা পরিচালনায় মোটেই দক্ষ নয়। ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থরা ঝুঁকিবহুল ক্ষেত্র অপেক্ষা চলচ্চিত্র, ললিতকলা, কাব্য সাহিত্যে বেশি দক্ষ। লায়ন্স রেঞ্জ বা বড়বাজার অপেক্ষা কলেজ স্ট্রিট, নন্দনই তাদের বেশি প্রিয়। অর্থনীতির দুটো নোবেলই তাদের দখলে। কিন্তু আজকের বাম বাঙ্গালির তত্ত্ব 'মার্ক্সবাদ অবিনশ্বর, কারণ ইহা সত্য' বোঝা কঠিন। একজন ক্রেতা ও বহু বিক্রেতার শ্রমের বাজারে ট্রেড ইউনিয়ন একটা ইলিউশন। এই বাস্তবকে সরিয়ে রেখে ১৯৬৭ সালে মার্ক্সবাদীরা সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বললো— শ্রমিকরা মালিককে ঘেরাও করলে পুলিশ যাবে না। উচ্চ আদালত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলে সরকার পরে legitimate এবং unlawful action শব্দগুলো যোগ করে। ১৯৭৪ সালে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে 'gherao' শব্দ ঠাঁই পায়।

১৯৬৮ সালের ১২ জানুয়ারি। জয় ইঞ্জিনিয়ারিঙের Executive Vice President নীলকণ্ঠ রত্নাকর ডোঙ্গরা ফ্যাক্টরি থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বোমার আঘাতে গাড়ির চালক গুরুতর আহত হলেন। বাড়ি ফিরে সব জরুরি কাগজ নিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল্লি চলে গেলেন। কারখানা কয়েক মাস বন্ধ থাকল। তাঁর আনুগত্যে খুশি হয়ে মালিক চরতরাম তাঁকে পার্টনার বানিয়ে নিলেন।

শিল্পপতি সিঙ্ঘানিয়ার আসানসোলের কাছে অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়াকে দেশের প্রথম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনকারী সংস্থা ভাবা হয়। দু'ঘণ্টা ধরে ওয়ার্কস্ ম্যানেজারকে শ্রমিকরা পেটানোর পর সিঙ্ঘানিয়া মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জির কাছে যান। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি বললেন শ্রমিকদেরই পেটানো হয়েছে। সিঙ্ঘানিয়াজী পুত্র হরিশঙ্করকে নিয়ে দিল্লি গিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেন।

১৯৭০ সালে আরএন মুখার্জি রোডের উপর ১৭ তলা বিল্ডিং বানিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় টাটা সেন্টারের মতো বিড়লাদের সব অফিস ওখান থেকে পরিচালিত হবে। তার আগে ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস থেকে সব অফিস পরিচালিত হতো। শ্রমিকরা প্রথম দু'সপ্তাহ কোনো কাগজ অফিসে নিয়ে যেতে দেয়নি। ১৯৭২-এ রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হলে পুলিশের সাহায্যে প্রবেশ করে । ততদিন শহরে ৩২টা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বিড়লারা কাজ চালায়। আজও ভবনের মূল ফটকের সামনে লেখা আছে— occupied since 1972।

বিদ্যুৎ সংকটে প্রায় দেউলিয়া কোনো এক শিল্পপতি সাহায্য চাইতে গেলে জ্যোতিবাবু বলেন পুঁজিপতিরা শ্রেণীশত্রু।

পতনে রাশ টানার ব্যর্থ চেষ্টা ঃ বিচিত্রানুষ্ঠানে কৌতুকাভিনেতা জহর রায়কে আগাম টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান বাতিল করা হলে সেই টাকা ফেরত চাইতে যায় কর্মকর্তারা। জহরবাবু টুথপেস্ট এনে কিছুটা মাজন বার করে ঢোকাতে বলেন। নব্বই য়ের দশকে জ্যোতিবাবুর শিল্প ভাবনাকে এমন টুথপেস্ট সিন্ড্রোম আখ্যা দেওয়া যায়।

১৯৯৫ সালে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির শতবর্ষ অনুষ্ঠানে সোমনাথ চ্যাটার্জি ও জ্যোতি বসুর চেষ্টাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ওড়িশা, কর্ণাটক, হরিয়ানা বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে একের পর এক মউ স্বাক্ষর করার সময় আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ কেবল দর্শক হয়েছিল।

কম্পিটিটিভ ফিসক্যাল ফেডারালিজম জিরো সাম গেম হলে বিনিয়োগকারীরা সবুজ চারণভূমি খুঁজবেই। এই রাজ্যের শিল্প বন্ধ্যাত্বের মরুভূমিতে কেবল গোয়েঙ্কা আর নেয়োটিয়ার মতো ভেরেন্ডারা শালপ্রাংশু হতে চাইবে। তাই সাহাগঞ্জে ডানলপ, রূপনারায়নপুরে হিন্দুস্তান কেবল, দমদমে জেশপ, আসানসোল-রানিগঞ্জে সেন-র‍্যালে, দুর্গাপুরে এম এ এম সি, বরানগরে বেঙ্গল ইমিউনিটি আজ এক ভৌতিক নীরবতার শিকার।

'সত্য রে লও সহজে' ঃ উন্নয়ন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ফসল। প্রথম ফরেন সেক্রেটারি কেপিএস মেনন তাঁর মেময়ার্স অ্যান্ড মিউসিংস্-এ লিখেছেন, 'কেরালায় ক্যালকাটা থেকে খবরের কাগজ এলে আমরা তাকিয়ে থাকতাম কার্জনের ক্যালকাটার দিকে। ভারতে যেটাই প্রথম আসতো বা ঘটতো সেটা ক্যালকাটায়।' আমাদের আলোচনার সময়কালটিতে দেখলাম কার্জনের ক্যালকাটা কেবল তার নামের বদলই ঘটায়নি, ঘটে গেছে ধারাবাহিক অবরোহণ। এই অবস্থা থেকে হঠাৎ মুক্তি সম্ভব নয়। এমন নয় যে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখব পশ্চিমবঙ্গ আবার শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য হয়ে গেছে। এটা না হওয়ার প্রধান কারণগুলো হলো :

এক। এই রাজ্যের প্রতিবন্ধী ভৌগোলিক মানচিত্র।

দুই। একেবারে লাগোয়া একটি ভয়ানক জনবহুল ও দরিদ্র মুসলমান দেশ।

তিন। অনুপ্রবেশ ও বাম-কংগ্রেস অক্ষশক্তির প্রবল কেন্দ্র বিরোধিতা।

চার। কোনো দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অভাব।

হোপ ৮৬-র সময় থেকে দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলির বিলয় ঘটার পর হকার, ব্রোকার, অটোচালক ছাড়া যে ক্লাব নির্ভরতা এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে সেখানে এহেন বন্ধ্যা শিল্প মানচিত্রে কোনো বিনিয়োগকারীই এগিয়ে আসবে না। নূতন যুগের ভোরে এই রাজ্যকে শিল্পবান্ধব প্রমাণ করাই নতুন সরকারের কাছে সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে। □

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এক ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে থাকবে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

অবশেষে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু হোমল্যান্ডের স্বপ্ন সফল হলো। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭৯ বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে গঠিত হলো হিন্দুদের মন খুলে কথা বলার, প্রাণভর আনন্দ করার এবং ভয়হীন পরিবেশে বাঁচার অধিকার পাওয়া সরকার। যে হিন্দুরা দীর্ঘ বছর ধরে ভয়ে মুখ বুঁজে, কুঁকড়ে ঘরে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হয়েছিল, এবার তারা পাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পরিবেশ।

৯ মে ২০২৬ সকালে ব্রিগেডের ঐতিহাসিক ময়দানে জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবনের বদলে খোলা ময়দানে মানুষের সামনে শপথ নেওয়ার এই নজিরবিহীন অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। রাজ্যপাল আর এন রবির উপস্থিতিতে বঙ্গ রাজনীতর এক নতুন যুগের সূচনা হলো। ৯ মে, ২০২৬, শপথ নিতে যাওয়ার আগে নিজের বাসভবন থেকে বের হওয়ার সময় শুভেন্দু অধিকারী বলেন— 'আজ থেকে বঙ্গে সোনার বাঙ্গলা যুগের সূচনা হলো।' আর শপথ নেবার পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুবাবুর ঘোষণা— 'ভয়মুক্ত ও তোষণমুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়াই আমাদের লক্ষ্য।'

এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন--- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতীন নবীন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল,

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, স্মৃতি ইরানি, শিবরাজ সিংহ চৌহান, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ প্রমুখ। মঞ্চে এসে প্রথমেই আসন গ্রহণ না করে মাটিতে বসে নতমস্তকে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য প্রণাম জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মনে করিয়ে দিলেন— 'বলে গিয়েছিলাম আবার পশ্চিমবঙ্গে আসব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে।'

নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর দুই আসন থেকেই জয়ী হয়ে শুভেন্দু অধিকারী এদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, অশোক কীর্তনীয়া, ক্ষুদিরাম টুডু ও নিশীথ প্রামাণিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শপথের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানান আর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শুভেন্দুবাবুর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেন।

শপথ নেওয়ার পর জনতাকে উদ্দেশে করে নব নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী বলেন— 'এই ভিড়ই বলে দিচ্ছে, মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল। আমাদের সরকারের প্রথম কাজ হবে রাজ্যে শিল্পের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং প্রতিটি ঘরে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। পশ্চিমবঙ্গে ভয়মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি এই রাজ্যকে তোষণ থেকেও মুক্ত করা আমাদের লক্ষ্য।' জোড়াসাঁকোয় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন— 'এটা সমালোচনার সময় নয়, এখন অনেক দায়িত্ব।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন— 'ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের ভিত্তিতে যে দল তৈরি হয়েছে, তাদের কোনো সার্টিফিকেট লাগে না। আমি এখন কোনো বিতর্কিত মন্তব্য করতে চাই না। আমি মুখ্যমন্ত্রী, আমি এখন সকলের। যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁদের চৈতন্য হোক। এখন একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা হারিয়ে গিয়েছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এখন অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যাঁরা সমালোচনা করতে চাইছেন করুন। আমরা এখন শুধুই এগিয়ে যাব।'

অনেকেই মনে করছেন, এবারের নির্বাচন ছিল মমতা বনাম জনতার। খেলা একদিকে যেমন শুরু করেছিল অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান, রোহিঙ্গা এবং অপরাধীদের নিয়ে তৃণমূল, তেমনি রাজ্যের উৎপীড়িত, নির্যাতিত, আতঙ্কিত জনগণকে নিয়ে শেষ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পদ্মাসনে উপবিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ। অবসান হলো অপশাসনের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পায়নের ব্যর্থতা আর অহঙ্কার দম্ভে ভেঙে পড়ল পূর্বতন শাসকের তাসের ঘর। মোদী-শাহের বিজয়রথে চূর্ণ হলো স্বৈরাচারী শাসকের অহঙ্কার।

অস্তাচলে গেল তৃণমূল। গেরুয়া রঙে রঙিন হলো পশ্চিমবঙ্গ। কালিম্পং থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত হলো রঙের পরিবর্তন। পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে উৎখাত হলো দেড় দশকের দুর্নীতিগ্রস্ত, তোষণকারী এক স্বৈরাচারী শাসক। দীর্ঘদিন মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে না পেরে এবারে সেই সুযোগ পাওয়ায় যা হবার ঠিক তাই হয়েছে। এবারে পশ্চিমবঙ্গে ভোট পড়েছে ৯২.৯ শতাংশ ভারতের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। যা নির্বাচন কমিশনকে যাঁরা ভ্যানিশ কুমার বলেছিলেন তাঁরাই আজ ভ্যানিস। শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে সুন্দর পশ্চিমবঙ্গে এবার ভোটপরবর্তী হিংসামুক্ত পরিবেশে আগামী পাঁচ বছর উন্নয়নের প্রত্যাশা করছে রাজ্যবাসী।

তৃণমূল দলের এবারের ভোটে ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার কারণগুলো হলো— (১) নির্বাচনী জনসভায় দাঁড়িয়ে মমতা ব্যানার্জি গান গেয়েছিলেন— 'আমার হৃদয়ে কাবা, নয়নে মদিনা।' এসব গেয়ে তিনি মুসলমানদের সমর্থন আদায় করতে চেয়েছিলেন। অথচ তিনি জানেন না যে, মক্কা-মদিনায় অসুমলমানদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (২) মমতা ব্যনার্জির ন্যাক্কারজনক মুসলমান তোষণের প্রমাণ তাঁর বিগত অন্তর্বর্তী বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের উন্নতিকল্পে ৫,৫৩০.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা, যেখানে বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে মাত্র ৭৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। (৩) সীমান্ত সুরক্ষার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে না দেওয়া। (৪) নির্বাচনী প্রচারে তাঁর সেই তোষণমূলক ভয়ঙ্কর উক্তি— 'আমরা আছি বলে আপনারা এখনও টিকে আছেন। আমরা যদি চলে যাই তাহলে একটা কমিউনিটি এক সেকেন্ডে আপনাদের বারোটা বাজিয়ে দেবে। যদি নিজের তেরোটা বাজাতে না চান তাহলে বিজেপির কথায় কান দেবেন না' ইত্যাদি। আর এসব কারণেই হিন্দু সমাজ একজোট হয়ে এমনভাবে সেই মমতা ব্যানার্জির তোষণ রাজনীতির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, যা তিনি আজীবন মনে রাখবেন।

২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারকে পরাজিত তৃণমূল দল ক্ষমতায় এসেছিল। সে সময় রাজ্যের মানুষ যতটা খুশি হয়েছিলেন, ২০২৬ সালে মমতা ব্যানার্জির পতনে তার থেকে অনেক বেশি খুশি ও আনন্দিত হলেন। কিন্তু কেন এমন পরিবর্তন রাজ্যের মানুষের? কারণ রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবর্তে জনগণের হাতে দানখয়রাতির সামান্য কিছু টাকা গুঁজে দিতেন। কলকারখানা, চাকরি দেওয়া এমন পরিত্রাণদাত্রী হওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। তিনি রাজ্যের ভোটারদের নিরক্ষর, মুর্খ, লোভী ভাবলেও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে রাজ্যবাসী বুঝিয়ে দিলেন তাঁরা যথেষ্ট সচেতন ও বুদ্ধিমান। পশ্চিমবঙ্গবাসী ত্রাণ চান না, তাঁরা মমতা ব্যানার্জির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চান, সেই জন্যই এই পরিবর্তন।

এছাড়া মমতা ব্যানার্জির বিরামহীন ভুল সিদ্ধান্ত। কখনো কাজ বা রূপায়ণে নিষ্ক্রিয়তা, কখনো অতি সক্রিয়তা, কখনো-বা পক্ষপাতদুষ্ট পদক্ষেপ। সিএএ, ওয়াকফ আইন, এস আই আর-এর অন্ধ বিরোধিতা, মুসলমানদের দুধেল গাই বলে সম্বোধন, হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতি অকথ্য ভাষায় গালাগালি করা, সরকারি চাকরি বিক্রি, সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ-র বিরোধিতা করা, কয়লা, বালি, গোরু ইত্যাদি প্রতারণা, বিজেপির বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ, দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী, কেন্দ্রের বিভিন্ন তদন্ত সংস্থার বিরুদ্ধে অমূলক আক্রমণ মানুষের মনকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতার নামে শ্রীরামের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন, দুর্গা, সরস্বতী পূজার চেয়ে মহরম ও ইফতারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধাদান, শিক্ষাক্ষেত্রে সিলেবাসে ইসলামীকরণের প্রবণতা, নারী সুরক্ষায় ব্যর্থতা, রাজ্যের নানাস্থানে ধর্ষণ এবং হত্যার পরও অপরাধীদের সাজা না দেওয়া, বিশেষ করে অভয়া ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে বিশাল গাফিলতি, সমাজবিরোধীদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন, দেশবিরোধীদেরকে রাজ্যে আশ্রয়দান, অবৈধ অনুপ্রবেশ- কারীদের পক্ষে সওয়াল, পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, ওয়াকফ আইনের জন্য মুর্শিদাবাদ বা অন্য জায়গা থেকে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে তাদের গ্রামছাড়া, জেলাছাড়া হতে বাধ্য করা, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি খেয়ে পথে বসিয়ে দেওয়া, শিল্প-শিক্ষা- বিজ্ঞান-স্বাস্থ্যের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রভৃতি অজস্র কারণ তাঁর করুণ পরিণতির জন্য দায়ী।

সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশংসা করেছেন সকলেই। কারণ, নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের কুকর্মের সব পথ বন্ধ করেছে। এবারের নির্বাচনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী-সহ ১৬ জন মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া এবারের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হলো, ৯টি জেলায় তৃণমূল খাতা খুলতেই পারেনি। এই জেলাগুলি হলো আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্বমেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান। এবারের নির্বাচনে রাজ্যের হিন্দুরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে পৃথিবীর কোনোও শক্তি তাঁদের দমন করতে পারবে না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী যখন শপথ গ্রহণ করলেন, তখন থেকে তাঁর কাঁধে এক বিশাল দায়িত্ব এসে পড়ল। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, কৃষি উন্নয়ন থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রভৃতি পুনরুদ্ধারের যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়েছেন, তা আজ কোটি কোটি মানুষের মনের কথা।

ব্যক্তিগত শোক, রাজনৈতিক আক্রমণ এবং আইনি জটিলতাকে উপেক্ষা করে তিনি যেভাবে নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন, তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক শিক্ষণীয় বিষয়। আর সে কারণেই মানুষের আকাশচুম্বি প্রত্যাশা পুরণে রাজ্যের নতুন সরকার সম্পূর্ণভাবে সফল হবে সেই আশা নিয়েই অপেক্ষা করছে আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসী। □

চন্দননগরের দুই বিপ্লবী বন্ধু
বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

সৈকত নিয়োগী

বঙ্গের বিপ্লবী কার্যকলাপের অস্ত্র সংগ্রহে এই দুই বন্ধুর আন্তর্জাতিক যোগসূত্র প্রধান ভূমিকা পালন করে। চন্দননগরের মাটিতে কৈশোরে যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, আজীবন সেই স্বপ্নকে লালন করে এক অখণ্ড ও স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতেই তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন।

টোকিয়ো শহরটা ঘুমন্ত তখন। খোলা জানালা দিয়ে অন্ধকারেও সাকুরা গাছের সাদা ফুলগুলোতে স্ট্রিট লাইটের আলো পড়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই পথটা দেখতে অনেকটা গঙ্গার তীরে চন্দননগরের স্ট্র্যান্ড রোডের মতো। ফরাসি দপ্তর থানার মতোই টোকিয়োর সিনজিকুতে সেনহোম রাস্তাটার দুই ধারে সরকারি আধিকারিকদের আবাস। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না এখানেই রয়েছে প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর 'ফোর কে সোসাইটি'। রয়েছেন স্বয়ং বিপ্লবী মহানায়ক। স্বপ্নে তিনিও বিভোর— কবে আসবে সেই দিন যখন নির্ভয়ে ভারতবর্ষের রাস্তায় রাস্তায় উঠবে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত স্বাধীনতার পতাকা।

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় মহাবিপ্লবী এবং বিদেশ থেকে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্থপতি। অসাধারণ কৌশলগত দক্ষতা, ছদ্মবেশ ধারণের পারদর্শিতা এবং বহু ছদ্মনাম ব্যবহার করে তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের একের পর এক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। সশস্ত্র জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

রাসবিহারী বসুর জন্ম ১৮৮৬ সালের ২৫ মে বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তিনি চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজে অধ্যয়ন করেন। ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারী চরিত্রের প্রতি তিনি শুরু থেকেই তীব্র বিরোধিতা পোষণ করতেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই তিনি কলকাতার উপকণ্ঠে সক্রিয় গোপন বিপ্লবী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হন। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মুরারীপুকুর গোপন সমিতির নথিপত্রে তাঁর নাম উল্লেখ রয়েছে। তিনি অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন; এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সতীশচন্দ্র বসু এবং ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র। যদিও তিনি ছিলেন কঠোর নিয়মানুবর্তী বিপ্লবী, স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনাও ছিল।

আলিপুর বোমা মামলার পর নজর এড়াতে তিনি ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দেরাদুনে চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে থেকেও তিনি পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন। এই কৌশলগত পদক্ষেপ তাঁকে গদর পার্টির সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত হতে সাহায্য করে। ১৯১২ সালে তিনি তৎকালীন ভাইসরয় চার্লস হার্ডিঞ্জকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তিনি নিজেকে ব্রিটিশপন্থী বলে উপস্থাপন করে দেশজুড়ে অর্থসংগ্রহ চালান এবং সেই অর্থ ভবিষ্যৎ বিপ্লবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠনের কাছে পৌঁছে দেন। ১৯১৫ সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ সংঘটনের চেষ্টা করেন, কিন্তু পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি।

এরপর তিনি গোপনে ভারত ত্যাগ করে জাপানে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকে স্বাধীনতার অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখেন। জাপানে তিনি গেনইয়োশা-সহ বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং মিৎসুরু তোয়ামার মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ করেন।

তাঁর প্রচেষ্টায় জাপান, সিঙ্গাপুর এবং পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এই যোগাযোগ পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ভিত্তি রচনা করে।

রাসবিহারী বসু গোপন দূত, ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রবর্তক সঙ্ঘের বাণিজ্যিক উদ্যোগ, স্বরাজ পার্টি এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তিনি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর অনুপ্রেরণার চন্দননগরে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ে আজীবন জাগরূক ছিল।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ডুপ্লে কলেজের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম সর্বাধিক কার্যকর ও রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। তাঁর অধিকাংশ কর্মকাণ্ড আজও রহস্যাবৃত প্রধানত তাঁর অসাধারণ ছদ্মবেশ ধারণের ক্ষমতার কারণে। ব্রিটিশ পুলিশ কর্মকর্তা এস সি পলিত প্রথম তাঁকে মুরারিপুকুর গোপন সমিতিতে যাতায়াত করতে দেখে শনাক্ত করেছিলেন, কিন্তু আরও বহু ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে নজর এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। চন্দননগরে বোমা তৈরি প্রক্রিয়া গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কলকাতার সহযোদ্ধাদের কাছে তিনি 'খুড়ো' নামে পরিচিত ছিলেন। ছদ্মবেশের অংশ হিসেবে তিনি কখনও কখনও খঞ্জ সেজে কলকাতার রাস্তায় চলাফেরা করতেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই আলিপুর বোমা মামলার অভিঘাত চন্দননগরের গোপন বিপ্লবী সংগঠনের অস্তিত্বকে নষ্ট করতে পারেনি। বিচার চলাকালীন তিনি রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন।

১৯০৬ সালে শ্রীশচন্দ্র কলকাতার বিখ্যাত হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সুযোগ তাঁর জীবনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং তিনি অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তরের সাহসী কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। এই সময়েই তাঁর পরিচয় ঘটে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের সঙ্গে। শুরু থেকেই তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন।

সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম পথপ্রদর্শক অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায় তাঁর বাড়ির বারান্দায় নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন করতেন। ডুপ্লের কলেজের ছাত্রদের পাশাপাশি অন্যান্য স্থান থেকেও বহু ছাত্র সেখানে আসতেন। শ্রীশচন্দ্র ছিলেন নিয়মিত উপস্থিত সদস্য এবং চারুচন্দ্র তাঁকে স্নেহভরে 'কালোমণি' বলে ডাকতেন। ডুপ্লে কলেজে তিনি তাঁর আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পড়াশোনা করেন, যাঁকে তিনি 'রাসু' নামে ডাকতেন। সেই গোপন বৈঠকগুলিতে কানাইলাল দত্ত, মতিলাল রায়, আশুতোষ নিয়োগী প্রমুখ বিপ্লবী ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতেন।

বঙ্গভঙ্গের পর ডুপ্লে কলেজের এই গোষ্ঠী জনআন্দোলনের দিকে মনোনিবেশ করে। চারুচন্দ্র রায় চন্দননগরে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানান। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা যুবসমাজের মনে গভীর জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করে। ফরাসি প্রশাসন এই রাজনৈতিক জাগরণকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিল। ১৯০৬ সালে স্বরাজ ও বয়কট আন্দোলন তুঙ্গে থাকাকালে শ্রীশচন্দ্র মতিলাল রায়ের 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়'-এর সঙ্গে চারুচন্দ্র রায়ের 'রিপাবলিকান সিক্রেট সোসাইটি'-র সংযুক্তি ঘটান। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শক্তিগুলি একটি অভিন্ন মঞ্চে একত্রিত হয়।

পরের বছর বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে চন্দননগরে এসে চারুচন্দ্র রায়ের বাড়িতে বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হন। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন দুই বন্ধু রাসবিহারী ও শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। তখন যুগান্তরের পতাকাতলে বিপ্লবী কর্মসূচির সূচনা হয়ে গেছে। কলকাতার ১৩৪ হ্যারিসন রোড থেকে 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দে মাতরম্'-এর মতো বিপ্লবী পত্রিকা প্রচারিত হচ্ছিল এবং ডুপ্লে কলেজের ছাত্ররা সেগুলি চন্দননগরে বিতরণ করতেন।

চন্দননগরের হাটখোলায় এক স্বদেশি সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা হয়। কিন্তু চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ো টার্ডিভাল অনুমতি না দেওয়ায় বিপ্লবীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল তাঁর বাসভবনে হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটে। এই সময় শ্রীশচন্দ্র, মতিলাল রায়, কানাইলাল দত্ত প্রমুখ প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। পরে মানকুণ্ডু স্টেশনের কাছে বাঙ্গলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের উপরও হামলার চেষ্টা হয়।

মুজফ্‌ফরপুরে বিচারক ডগলাস কিংসফোর্ডকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপের পর চন্দননগরের বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন এবং আন্দোলনের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। তবু শ্রীশচন্দ্র ও মতিলাল রায় সংগঠনকে সচল রাখেন। চুঁচুড়ার কাছে এক নির্জন স্থানে তিনি গোপন বৈঠকের আয়োজন করেন, যেখানে উত্তরপাড়ার নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ বহু বিপ্লবী যোগ দেন। গভীর রাতে তিনি রেললাইনের ধারে মতিলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কলকাতার বিপ্লবীদের সংবাদ আদানপ্রদান করতেন। ১৪৫, অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটে তাঁর একটি ঘর ছিল, সেখান থেকে বোমা তৈরির উপকরণ সরবরাহ করা হতো।

১৯১০ সালে তিনি জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মিলে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসার জি সি ডেনহ্যামকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। ১৫ আগস্ট এ উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক ডাকা হয়। বিপ্লবী ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন এবং প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বোমা বিস্ফোরিত হয়নি। রাইটার্স বিল্ডিঙের নিরাপত্তা ভাঙার এটিই ছিল প্রথম সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা। নরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিষ ঘোষের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্রও গ্রেপ্তার হন।

রাসবিহারী বসু জাপানে একটি গুপ্তচর সংস্থা গড়ে তোলেন। জাপানের 'ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটি'র সঙ্গে সেই প্রত্যক্ষ যোগ শ্রীশচন্দ্র ঘোষের মাধ্যমে বঙ্গের মাটিতে সঞ্চারিত হয়েছিল। বঙ্গের বিপ্লবী কার্যকলাপের অস্ত্র সংগ্রহে এই দুই বন্ধুর আন্তর্জাতিক যোগসূত্র প্রধান ভূমিকা পালন করে। চন্দননগরের মাটিতে কৈশোরে যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন, আজীবন সেই স্বপ্নকে লালন করে এক অখণ্ড ও স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতেই তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন। □

সরকারি স্থানে এত মসজিদ কেন?

এই পত্র লিখছি জীবনের দায়বদ্ধতা থেকে, মনুষ্যত্বকে বাঁচাতে। সবার উপর মহামান্য হাইকোর্ট। তার উপরে মসজিদ! হাইকোর্টের অ্যানেক্স বিল্ডিঙের একেবারে ছাদের উপরে এই মসজিদ। হাইকোর্টের প্রতিটি গেটে গেটে অতন্দ্র পুলিশ পাহারা। অ্যাডভোকেট বাবুরা কালো ড্রেস পরে অনায়াসে গেট পার হয়ে কোর্টে প্রবেশ করতে পারেন। পুলিশের ক্ষমতা নেই তাঁদেরকে চেক করার। কোনো জেহাদিও কালো ড্রেস পরে অ্যাডভোকেটের মতো অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে বোমা নিয়ে। পুলিশের একমাত্র কাজ নিরীহ বিচারপ্রার্থীদের বিড়ম্বনায় ফেলা। তারা গেটে গেটে চেকিঙের নামে পাবলিককে হয়রানি করে। এতো হাইসিকিউরিটি থাকা সত্ত্বেও হাইকোর্টের ছাদের ওপরে মসজিদ তৈরি হয়? কি করে অনুমতি পায়? দলবল নিয়ে সগৌরবে নামাজ পাঠ হয় প্রকাশ্য দিনের বেলায়।

হাইকোর্টে আর একটা মসজিদ আছে যা 'মসজিদ বাড়ি' নামে পরিচিত। প্রতিদিন তো নামাজ পাঠ হয়। জুম্মা নামাজ মানে প্রতি শুক্রবার স্পেশাল। জুম্মা নামাজের সময় হাইকোর্টের একটি ডিপার্টমেন্ট— নিউ রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট অংশ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। ওই সময় সেখানে থেকে কোর্টের রেকর্ড বের করা যায় না। এক শ্রেণীর হাইকোর্ট কর্মচারী হাইকোর্টের কাজকর্ম শিকেয় তুলে ওই জুম্মা নামাজে অংশগ্রহণ করে। ওই সময় যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে পথজুড়ে মাদুর বিছিয়ে নামাজ পাঠ হয়। প্রচুর নামাজির সমাবেশ হয়। হাইকোর্টে ১৪৪ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও এক সঙ্গে এত নামাজির সমাবেশ কী করে হয়? হাইকোর্ট থেকে সমস্ত মসজিদ অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা দরকার। ইডেন গার্ডেন স্টেশনের কাছে মিলেনিয়াম পার্কের মধ্যে একটি মসজিদ আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট স্টেশন সংলগ্ন দুটো মসজিদ আছে। ১নং প্লাটফর্ম দিকে একটা, আর একটা ২ নং প্লাটফর্ম দিকে একটা। রেলের জায়গায় দখল করে মসজিদ তৈরি তো হয়েই যাচ্ছে। মগরাহাট (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) বাজারের মধ্যে খাল পাড় দখল করে রাতারাতি হঠাৎ একটা মসজিদ গজিয়ে উঠতে দেখেছি। লক্ষ্য একটাই, মসজিদ তৈরি করা। তৃণমূল দখলদারি বাড়ানো এই জেহাদিদের নিয়ে এতদিন রাজ্য রাজনীতির আঙিনায় 'খেলা হবে' বলে চিৎকার করছিল। তৃণমূলের পতন হয়েছে। রাষ্ট্রবাদী শক্তির উত্থান হয়েছে। হাইকোর্টের মতো জায়গায় যদি মসজিদ হয় অন্য জায়গায় মসজিদ হতে বাধা কোথায়? সরকারি জায়গায় যত মসজিদ আছে অবিলম্বে ভেঙে ফেলা হোক। অবৈধ সমস্ত মসজিদ স্কুলে পরিণত হোক নতুন সরকারের কাছে দাবি। বন্ধ হোক অবৈধ কসাইখানা। মগরাহাটে (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) একটা অবৈধ কসাইখানা রমরমিয়ে চলছে। পিছনে তৈরি হয়েছে রক্ত পুকুর যেখান থেকে দুর্গন্ধ, দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে এলাকায়। রক্তাক্ত তলোয়ার, রক্ত, ভয় মিশে ভয়ার্ত পরিবেশ ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। এই কসাইদের হাত থেকে আমরা কবে মুক্তি পাব? জেলা থেকে গ্রামে-গ্রামে, হাইকোর্ট থেকে সর্বত্র ভয়-সন্ত্রাসের দিন শেষ হোক। নতুন সূর্যোদয়ের পথে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলুক সোনার তরী হয়ে এরাজ্যের নদ-নদীতে। জানি, কোনোদিন হারাব না পশ্চিমবঙ্গকে মোল্লাবাদীদের ভিড়ে। সে যে আছে আমাদের হৃদয়ের মাঝে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সঙ্ঘ ও আনুষঙ্গিক সংগঠনের শক্তি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ আজ এক সুসংগঠিত জাতীয় চিন্তাধারার কেন্দ্রবিন্দু, যার প্রভাব সমাজজীবনের প্রায় প্রতিটি স্তরে বিস্তৃত। রাজনীতি, শিক্ষা, শ্রম, কৃষি, নারীশক্তি, সেবা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও জনজাতি সমাজ— প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঙ্ঘ প্রেরণায় আলাদা আলাদা সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এই বিস্তৃত সংগঠন কাঠামোর মূল লক্ষ্য একটাই— সাংস্কৃতিক চেতনার ভিত্তিতে জাতি গঠন।

আনুষঙ্গিক সংগঠনের এই পরিসর শুরু হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে কেন্দ্র করে, যাকে সাংস্কৃতিক জাতি গঠনের মূল সংগঠন হিসেবে ধরা হয়। এই মূল আদর্শকে সামনে রেখেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে গড়ে উঠেছে বহু ক্ষেত্রভিত্তিক সংগঠন, যারা নিজ নিজ কর্মপরিসরে কাজ করলেও বৃহত্তর লক্ষ্য একই— জাতীয় পুনর্গঠন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয়তাবোধ, সুশাসন ও উন্নয়নের প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে। ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ শিক্ষার পাশাপাশি জাতীয় চরিত্র গঠন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার কাজ করে চলেছে।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ শ্রমিক স্বার্থ, কল্যাণ এবং জাতীয় শিল্পনীতির পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের সমস্যা, কৃষিনীতি এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রশ্নে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘ কৃষক সমাজের স্বার্থরক্ষার সংগঠিত কণ্ঠস্বর। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যা ভারতী ভারতীয় মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে জাতীয় চরিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক সংহতির রক্ষক হিসেবে কাজ করছে। নারী সমাজকে সাংগঠনিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি নারীর চরিত্রগঠন, নেতৃত্ব বিকাশ এবং সামাজিক অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেবামূলক কার্যক্রমে সেবা ভারতী দরিদ্র, বঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজসেবার বাস্তব উদাহরণ গড়ে তুলেছে। জনজাতি সমাজের স্বাবলম্বন, উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ দেশীয় শিল্প, স্বনির্ভর অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবোধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলছে।

বৌদ্ধিক ও মতাদর্শিক চর্চার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা প্রবাহ জাতীয় চিন্তাধারাকে বৌদ্ধিক স্তরে শক্তিশালী করার কাজ করে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সচেতনতা ও চিকিৎসকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে কাজ করছে। সমবায়ভিত্তিক আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো গঠনে সহকার ভারতী সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সঙ্ঘ প্রেরণায় আনুষঙ্গিক সংগঠনের এই বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো স্পষ্ট করে যে, এটি কেবল একটি মতাদর্শগত সংগঠন-গোষ্ঠী নয়— এটি একটি সমন্বিত জাতীয় শক্তি, যা সমাজজীবনের প্রতিটি স্তম্ভকে স্পর্শ করে দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক সংগঠন, সামাজিক উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সেবামূলক কার্যক্রম এবং বৌদ্ধিক চর্চার সমন্বয়ে সঙ্ঘ পরিবার এক বৃহত্তর জাতীয় সংগঠনদর্শনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই কাঠামোর কেন্দ্রে রয়েছে একটিই বার্তা— সংগঠন আলাদা হতে পারে, ক্ষেত্র আলাদা হতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য এক ও অভিন্ন— শক্তিশালী সমাজ, স্বনির্ভর দেশ এবং সাংস্কৃতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

চিন্ময় প্রভুর মুক্তি চাই

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট তথাকথিত 'অভ্যুত্থান'-এর নামে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল হিন্দু নিধন যজ্ঞ। অদ্যাবধি বন্ধ হয়নি সে ধ্বংস যজ্ঞ। হত্যা, ধর্ষণ, সম্পদ লুণ্ঠন, শারীরিক নির্যাতন, নারী অপহরণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ, মঠ-মন্দির-দেবালয় ও আশ্রম ভাঙচুর, ভূমি ও ব্যবসা কেন্দ্র দখল, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের নামে পাশবিক নির্যাতন--- ওই দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

ঘটনার প্রথম দিকে প্রতিবাদে মাঠে নেমেছিল হিন্দু যুব সমাজ। আন্দোলনের সূতিকাগার খ্যাত শাহবাগে শুরু হয় প্রতিবাদ সমাবেশ। প্রতিবাদ জন সমাবেশে যোগদান করেন তৎকালীন ইসকন বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রীমৎ চিন্ময়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। আন্দোলন আরও তীব্র হয় চট্টগ্রাম ও রংপুরে লক্ষ লক্ষ সনাতনী হিন্দুরা সমাবেশের পরে। ভীত সন্ত্রস্ত প্রশাসন তথাকথিত পতাকা অবমাননা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে চিন্ময় প্রভুকে। প্রভুকে পরপর ৮টি মামলায় আসামি করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি হত্যা মামলা, একটি দেশদ্রোহিতার মামলা ও বাকি মামলাগুলো দাঙ্গা-হাঙ্গামার মামলা। এখানে স্মরণীয় যে, একটি মামলা আছে মাছ চুরির। নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত এক সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে মাছ চুরির অভিযোগ। এছাড়া রংপুর, গাইবান্ধা, চট্টগ্রাম-সহ একাধিক জেলায় ১২টি মামলা দিয়ে সংখ্যালঘুদের গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করা হচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি চাপে মামলাগুলো পরিচালনা করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। এমনও হয়েছে মামলাগুলো পরিচালনার জন্য কোনো আইনজীবী পাওয়া যায়নি। এক পর্যায়ে মামলাগুলো ৮ মাস কেউ তদ্বির করেনি। খুলনা ও সাতক্ষীরার কয়েকজন আইজীবী গত নভেম্বর ২০২৫ থেকে মামলাগুলো পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করেন। তাঁরা মূলত চিন্ময় প্রভুর মামলাগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ শুরু করেন। লন্ডন শহরের শ্রীমতী পুষ্পিতা গুপ্ত ও তার বন্ধুরা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের কিছু মানুষ মামলা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

চিন্ময় প্রভুর মামলাগুলো থেকে ইতিমধ্যে দুটি মামলার জামিন হয়েছে বাকি ৬টি মামলা থেকে ৫টি মামলার জামিন প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মিস মামলা (মিস্লেনিয়াস কেস) দায়ের করা হয়। তবে কোনো সিনিয়র আইনজীবী সাহস করে মামলা শুনানি করতে আসতে চাননি। মামলায় জড়ালে তাদেরকে মব জাস্টিসের ভয় দেখানো হয়। কয়েকজন লুকিয়ে মামলাগুলো পরিচালনা করেন। এবছরের ১০ মে এবছরের ৫টি মামলার জামিন শুনানির রায়ের দিন ধার্য ছিল। বিচারপতিদ্বয় একটি মামলা ডিসচার্জ করে দিয়ে বাকি ৪টি মামলা জাজমেন্ট এর জন্য ২০২৬-এর ১১ মে ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে নিম্ন আদালতে অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালে দায়রা ১৩২/২৬ নং মোকদ্দমার সাক্ষী গ্রহণ শুরু হয়েছে। প্রতি ১৫ দিন পর পর মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ এবং শুনানি চলছে। আগামী ১ মাসের মধ্যে মামলার রায় প্রদান করা হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে। এটা নিশ্চিত যে, ওই মামলায় চিন্ময় প্রভুর মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। কারণ প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে।

'হিন্দু, হিন্দুত্ব, হিন্দুধর্ম সুরক্ষা ও হিন্দুর বিকাশ সাধন' এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে বাংলাদেশে হিন্দু সমাবেশ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রভুর গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে হিন্দু সংহতি আন্দোলন একবারেও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। ভেঙে পড়েছে হিন্দুদের মনোবল। প্রভুর জামিন বা মামলা থেকে মুক্তি এদেশের হিন্দুদের ঐক্যের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করবে। বাংলাদেশের হিন্দুদের ঐক্য সংহতি পুনরুদ্ধারের জন্য চিন্ময় প্রভুর জামিন অথবা মামলা থেকে অব্যাহতি খুবই প্রয়োজন। তাহলে হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস কিছুটা ফিরে আসবে। আর প্রভুর নেতৃত্বে হিন্দু সংহতি আন্দোলন এ দেশের জঙ্গিবাদ দমনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এবারের নির্বাচনে হিন্দুরা ভোট দিয়ে জঙ্গিবাদ দমনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এক কথায় বাংলাদেশ জঙ্গিমুক্ত হলে ভারতের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সুরক্ষা আরও নিশ্চিত হবে।

—দেবব্রত সরকার,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

নারীশক্তি ও রাজনীতি

অরুণা রায় চৌধুরী

সমাজের অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের বিকাশে নারীর অংশগ্রহণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একসময় নারীদের শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হতো, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীরা শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, প্রশাসন, সেনা, মহাকাশ এবং রাজনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে 'নারীশক্তি' শুধু একটি শব্দ নয়, এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির প্রতীক। রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি দেশের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী ও মানবিক করে তোলে।

নারীশক্তি বলতে নারীর আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা এবং সমাজ পরিবর্তনের সামর্থ্যকে বোঝায়। একজন নারী যখন সমাজের বিভিন্ন স্তরে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেন, তখন তিনি কেবল নিজের উন্নতি করেন না, বরং পুরো সমাজকেই এগিয়ে নিয়ে যান। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সেই শক্তিরই এক বাস্তব রূপ। কারণ রাজনীতি হলো দেশের প্রশাসন পরিচালনার প্রধান মাধ্যম, যেখানে মানুষের অধিকার, উন্নয়ন ও ন্যায়বিচারের বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়।

ভারতের ইতিহাসে নারীরা বহু আগে থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলি, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগল প্রমুখ নারী সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল। স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় রাজনীতিতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্ব রাজনীতিতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল।

বর্তমান সময়েও ভারতীয় রাজনীতিতে নারীদের উপস্থিতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে নারী মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক ও মন্ত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। নির্মলা সীতারামন কিংবা দ্রৌপদী মুর্মুর মতো নারীরা প্রমাণ করেছেন যে নারীরা শুধু সহানুভূতির প্রতীক নন, তাঁরা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সমান দক্ষ। তাঁদের সাফল্য দেশের লক্ষ লক্ষ নারীর কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণত নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু কল্যাণ, নারী সুরক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নের বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেন। ফলে নারীরা নেতৃত্বে এলে সমাজের নারীদের সমস্যাগুলিও বেশি গুরুত্ব পায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পুরসভায় নারীদের সংরক্ষণ নীতির ফলে বহু সাধারণ নারী নেতৃত্বের সুযোগ পেয়েছেন এবং গ্রামের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তবে এখনও রাজনীতিতে নারীদের সামনে নানা বাধা রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, আর্থিক অসুবিধা, সামাজিক কুপ্রথা এবং রাজনৈতিক সহিংসতা অনেক সময় নারীদের রাজনীতিতে আসতে নিরুৎসাহিত করে। অনেক পরিবার এখনও মনে করে রাজনীতি নারীদের জন্য নিরাপদ বা উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। এছাড়া রাজনৈতিক দলে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চ পর্যায়ে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বহু নারী পিছিয়ে পড়েন।

নারীজাতি ও রাজনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন নারী ও পুরুষ সমানভাবে প্রশাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন। নারীদের বাদ দিয়ে কখনো সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা যায় না। কারণ সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী, তাই তাঁদের মতামত ও নেতৃত্ব দেশের নীতিনির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের নারী আর শুধুমাত্র ঘরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ নন। তিনি আজ প্রশাসক, নেতা, সমাজসংস্কারক এবং পরিবর্তনের অগ্রদূত। রাজনীতিতে নারীর অগ্রগতি শুধু নারীদের সাফল্য নয়, এটি সমগ্র সমাজের অগ্রগতির প্রতীক। নারীশক্তির জাগরণই একটি ন্যায়ভিত্তিক, উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

সম্প্রতি সংসদ ও বিধানসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষণ নিয়ে দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হলো জাতীয় স্তরের রাজনীতিতেও নারীদের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। কারণ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব এখনও পর্যাপ্ত নয়। সংরক্ষণের মাধ্যমে আরও বেশি নারী নেতৃত্বের সুযোগ পাবেন এবং দেশের নীতিনির্ধারণে তাঁদের মতামত ও অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হবে।

তবে অনেকের মতে শুধুমাত্র সংরক্ষণই যথেষ্ট নয়; নারীদের উপযুক্ত শিক্ষা, রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে। তবেই তাঁরা প্রকৃত অর্থে দক্ষ ও স্বাধীন নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারবেন। আসন সংরক্ষণ নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে একটি ঐতিহাসিক ও ইতিবাচক পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ও সমতাভিত্তিক গণতন্ত্র গঠনে সাহায্য করবে। তাই নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং তাঁদের নেতৃত্বকে সম্মান জানানো সকলের দায়িত্ব। □

বারো বছর আগেই ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি টের পাওয়া যায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

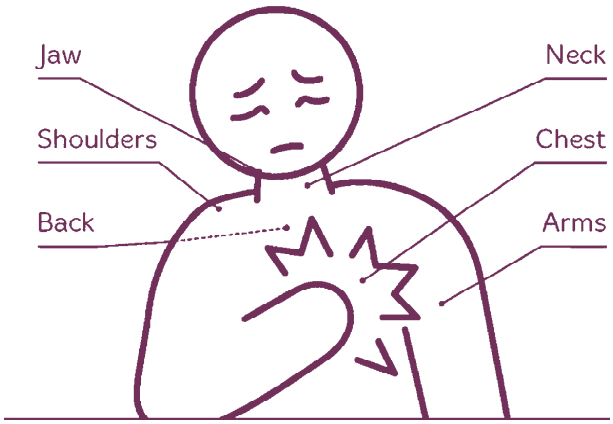

হার্ট অ্যাটাক বলতে সাধারণতভাবে তীব্র বুকে ব্যথার মতো কোনো উপসর্গের কথাই মনে হয়। কেউ কেউ হয়তো জানেন, এ ব্যথা পেটের ওপরের অংশেও হতে পারে। হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণকে অ্যাসিডিটি বা গ্যাসের ব্যথা ভেবে ভুলও করেন অনেকে। তবে সেসব তো হার্ট অ্যাটাকের সময়ের কথা। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার অনেক বছর আগেও নিজের শরীরে কিছু পরিবর্তন অনুভব করতে পারেন আপনি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনে প্রকাশিত গবেষণাপত্র থেকে জানা গেছে, যাঁদের হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেইলিউর বা স্ট্রোকের ঝুঁকি আছে, তাঁদের মাঝারি বা তীব্র ধাঁচের শরীরচর্চার সক্ষমতা কমে যেতে পারে বহু বছর আগে থেকেই। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ১২ বছর আগে থেকেই এই লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেলিওর বা স্ট্রোকের পূর্ববর্তী দু' বছরের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা অনেক বেশি কমে যায়।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩ হাজার ৬৮ জন ব্যক্তির মধ্যে পরবর্তী সময়ে হার্ট অ্যাটাক বা করোনারি আর্টারি ডিজিজ, হার্ট ফেইলিউর বা স্ট্রোক হয়েছিল ২৩৬ জনের। তাঁদের অসুস্থতার আগের বছরগুলোর লক্ষণকে বিশ্লেষণ করেছেন গবেষকেরা। তুলনা করে দেখেছেন অন্যদের সঙ্গে। আর তাতেই উঠে এসেছে এ তথ্য।

অনভ্যস্ত ব্যক্তি শরীরচর্চা শুরু করতে গিয়েই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন। হাঁপিয়ে উঠতে পারেন মাঝারি ব্যায়াম করতে গিয়ে। এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। অনভ্যস্ততা কাটিয়ে ওঠার উপায় আছে। ধীরে ধীরে নিজেকে ব্যায়ামে অভ্যস্ত করে তুলুন। প্রশিক্ষকের সহায়তা নেওয়া ভালো। হঠাৎ কোনো একটা দিন ব্যায়াম করতে গিয়ে ক্লান্ত বা অবসন্ন লাগলে সেটিকেও ভয়াবহ কোনো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করবেন না। বিশ্রাম নিন। ব্যায়ামের একটা ধারা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার পরে যদি ব্যায়ামের সক্ষমতা ক্রমাগত কমতে থাকে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

কেন আপনি আগের মতো ব্যায়াম করতে পারছেন না। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তা খুঁজে বের করবেন তিনি। এটি কি কেবল বয়সের কারণে শারীরিক সক্ষমতা কমে যাওয়া, নাকি হৃৎপিণ্ডের কোনো সমস্যার কারণে এমনটা হচ্ছে, তা বের করা প্রয়োজন। মাঝারি বা তীব্র ধরনের শরীরচর্চার সক্ষমতা কমে যাওয়ার যে লক্ষণের কথা বলা হচ্ছে, তা অনুভব করতে হলে আপনাকে এটাও জানতে হবে, কোন ধরনের ব্যায়ামের মধ্যে পড়ে। মাঝারি ব্যায়াম হলো সেসব ব্যায়াম, যা করতে গেলে আপনার হৃৎপিণ্ডের গতি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বাড়ে। মাঝারি ব্যায়াম শুরুর মিনিট দশেক পর হালকা ঘামতে শুরু করবেন আপনি। এ ধরনের ব্যায়ামের সময় কথা বলতে পারলেও স্বাভাবিক বা সুরেলা কণ্ঠে কিছু বলতে পারবেন না। অন্যদিকে ভারী ব্যায়ামে আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত ও ভারী হয়ে আসবে। হৃৎপিণ্ডের গতিও অনেক বাড়বে। তবে এক্ষেত্রে মাত্র কয়েক মিনিটেই ঘামতে শুরু করবেন আপনি। শ্বাস নেওয়ার জন্য বিরতি না নিয়ে কয়েকটির বেশি শব্দ বলতেই পারবেন না।

সুস্থ থাকতে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ট প্রিভেনশনের (সিডিসি) নির্দেশনামাফিক এ ধরনের ব্যায়াম করতে পারেন। তবে ব্যায়াম করতে গিয়ে নিজেকে অতিরিক্ত চাপে ফেলাও ঠিক নয়।

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শরীরচর্চা করুন এবং খেয়াল রাখুন, এই সক্ষমতা কমে যাচ্ছে কি না। তাহলে হার্ট অ্যাটাকের বহু বছর আগেই হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতাকে চিহ্নিত করার সুযোগ পাবেন আপনি। এমন ব্যায়াম করুন, যা আপনি উপভোগ করেন। ব্যায়াম ছাড়াও এমন ভাবে জীবনযাপন করুন, যাতে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা হয় কম। লিফটের বদলে সিঁড়ির ব্যবহার কিংবা যাতায়াতের পথে কিছুটা হাঁটা খুব ভালো অভ্যাস।

হৃৎপিণ্ডের সুস্থতায় শরীরচর্চার বিকল্প নেই। সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) নির্দেশনা অনুযায়ী, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সুস্থ থাকার জন্য সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি ধরনের শরীরচর্চা কিংবা অন্তত ৭৫ মিনিট তীব্র ধরনের শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। ▯

পশ্চিমবঙ্গে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নবনির্বাচিত সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৯ মে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার। ওইদিন রাজ্য মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণের পরই বিভিন্ন দৃঢ় ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও এরাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৬ মে পর্যন্ত রাজ্য সরকার দ্রুতগতিতে একের পর এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে স্বাস্থ্যবিমা সুরক্ষা প্রদানের বিষয়ে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই। সীমান্ত অসুরক্ষিত থাকার কারণে অব্যাহত ছিল চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ। বিগত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জমি না দেওয়ার কারণে সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করা সম্ভব হয়নি। গত ১১ মে প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— সম্পূর্ণ সীমান্ত সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আগামী ৪৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে বিএসএফ-কে হস্তান্তরিত করা হবে। রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত সব জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু থাকবে বলেও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অসংখ্য শূন্যপদে নিয়োগ বন্ধ থাকার কারণে সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত হয়েছে এরাজ্যের যুবসমাজ। এই কারণে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীদের বয়সসীমা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবনির্বাচিত সরকার। সাধারণ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ বছর এবং তপশিলি জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৪৮ বছর করা হয়েছে। ২০১১-র পর রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ মহলের আপত্তির কারণে এরাজ্যে কর্মরত আইএএস, আইপিএস, ডব্লুবিসিএস আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় সরকার বা ইউপিএসসি-র কোনো প্রশিক্ষণে যেতে পারতেন না। ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের আপডেটেড হওয়ার সুযোগ প্রায় ছিল না। কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে যাওয়ার ক্ষেত্রে বা কেন্দ্র-রাজ্যের কোনো কনফারেন্সে যোগদানের ব্যাপারেও প্রতিটি ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই অনুমতি পাওয়া যেত না। নতুন সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর ঘোষণা করেছে যে, রাজ্যে কর্মরত সরকারি আধিকারিকরা এবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেনিঙে যোগদান করতে পারবেন।

২০১১ সালে গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও সংঘটিত হয় 'জনগণনা'। তারপর থেকে রাজ্য সরকারের চরম অসহযোগিতার কারণে কেন্দ্রীয় নীতি অনুসরণে জনগণনার কাজ এরাজ্যে হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন 'দ্য অফিস অফ দ্য রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়া' বা আরজিআই-এর নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে জনগণনার কাজ শুরু হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন সড়কে অবৈধ টোল প্লাজা স্থাপন করে পুলিশ-প্রশাসনের একাংশ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের যোগসাজশে যানবাহনের থেকে চলত তোলাবাজি। এইসব টোল প্লাজা বন্ধ করে বেআইনিভাবে টোল ট্যাক্স আদায় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। স্কুটার-বাইকের মতো দ্বিচক্রযান আরোহীদের ক্ষেত্রে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। এর সঙ্গে এক্সটেনশনে থাকা ২৪৮ জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিকের চাকরির মেয়াদবৃদ্ধি বাতিল করেছে নবনির্বাচিত সরকার। গত ১১ মে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জারি হওয়া একটি নির্দেশিকার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কমিটি,

কমিশন ও সরকারি সংস্থায় স্থান পাওয়া মনোনীত ব্যক্তি ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কার্যকালের মেয়াদের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। রেশনে যে গুণমানের খাদ্যসামগ্রী এতদিন দেওয়া হতো, তা খাওয়ার অযোগ্য বলে রাজ্য জুড়ে ছিল অসংখ্য অভিযোগ। সেই বিষয়টিতে রাজ্য সরকার দৃষ্টি দেবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। রেশনে গম দেওয়ার পরিবর্তে এতদিন সাধারণ মানুষের খাওয়ার অনুপযুক্ত আটা দেওয়া হতো। এবার এই ধরনের অখাদ্য আটার পরিবর্তে পুনরায় গম দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। গত ১১ মে থেকে মন্ত্রীসভার বৈঠক ছাড়াও উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই রাজ্য জুড়ে সক্রিয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে করে রাজ্য পুলিশ। গত ১১ মে পৌরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। এই তদন্তে প্রথমে অসহযোগিতা করলেও গত ১৫ মে শেষমেশ ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষ। জমি দখল, তোলাবাজি ও আর্থিক তছরুপের মামলায় কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসকে গত ১৪ মে গ্রেপ্তার করে ইডি। ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের শাগরেদ সইদুল খানকে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগে গত ১৬ মে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ১৪ মে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারির জারি করা নির্দেশিকার মাধ্যমে এরাজ্যে প্রকাশ্যে গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়। 'রাজ্যশ্রী চৌধুরী বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার'-এর মামলায় (রিট পিটিশন নং- ৩২৮/২০১৮) কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে ১৬.০৮.২০১৮ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী— 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যানিমাল স্লটার কন্ট্রোল অ্যাক্ট, ১৯৫০'-এর বিভিন্ন ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকাশ্যে গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

আরজি কর হাসপাতালের ছাত্রী ডাঃ অভয়া হত্যা মামলার ক্ষেত্রে যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছিল তিন আইপিএস-এর বিরুদ্ধে। ডাঃ অভয়া হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গাফিলতি ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে গত ১৫ মে প্রাক্তন কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, প্রাক্তন ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ডিসি (নর্থ) অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। অভিযুক্ত তিন অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত চলবে বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গত ১৫ মে এসএসকেএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে বেডের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো হবে বলে জানান তিনি। 'পেশেন্ট রিফিউজাল' চলবে না বলেও তিনি নির্দেশ দেন। সরকারি হাসপাতালে দালালরাজ শেষ করা হবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সব কর্মীকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। এছাড়াও অ্যাপ-ভিত্তিক অ্যাম্বুলেন্স ট্র্যাকার পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্তের ঘোষণাও তিনি করেন। বিগত রাজ্য সরকারের অসহযোগিতা ও বাধাদানের কারণে নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো প্রকল্প বা অরেঞ্জ লাইনের অন্তর্গত চিংড়িঘাটার ৩৬৬ মিটার-দীর্ঘ ভায়াডাক্ট বটলনেক-এর কাজ এতদিন স্থগিত ছিল। সেই কাজে ছাড়পত্র দিল নবনির্বাচিত সরকার। প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে একাধিক কয়েদি মোবাইল ফোন ব্যবহার করে অপরাধচক্র চালাচ্ছিল বলে সরকারের কাছে খবর ছিল। সংশোধানাগারে উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা পরিদর্শনের পর একাধিক কয়েদির কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় জেল সুপার-সহ একাধিক অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে রাস্তা দখল করে নমাজ পড়া বন্ধ হয়েছে। গত ১৫ মে রাজাবাজারে মুসলমানরা রাস্তা দখল করে জুম্মা নমাজে উদ্যত হলেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মসজিদের ভিতরে তারা নমাজ পড়ে। লাউড স্পিকার বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করে আজানের ব্যাপারেও নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য প্রশাসন। গত ১২ মে কলকাতার তিলজলা এলাকায় একটি চামড়ার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকল বিভাগ, কেএমডিএ ও কলকাতা পুরসভার যৌথ তদন্ত কমিটি তাদের দেওয়া রিপোর্টে জানায়, অবৈধভাবে নির্মিত বাড়িটিতে বেআইনিভাবে চলছিল এই কারখানা। এই অবৈধ বাড়িটি ভেঙে ফেলার জন্য উদ্যোগী হয় প্রশাসন। ব্যবহৃত হয় বুলডোজার। তিলজলা, তপসিয়া, খিদিরপুর, গার্ডেনরিচ, একবালপুর, মোমিনপুর, মেটিয়াবুরুজ— কলকাতা জুড়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গত ৪০-৫০ বছরে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য বেআইনি নির্মাণের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকারি কমিটি গঠনের ঘোষণাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। 'বিশ্ববাংলা লোগো'র পরিবর্তে রাজ্য সরকারি প্রতীক হিসেবে ভারতীয় সংবিধান-স্বীকৃত 'অশোক স্তম্ভ' ব্যবহারের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যে বিএনএস কার্যকর করেছে নতুন মন্ত্রীসভা।

একনজরে ২০২৬-পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিধানসভা কেন্দ্র : ১১৯— বারাসত
জয়ী : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২২,১৭১
পরাজিত : সব্যসাচী দত্ত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৬১৩
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,৫৫৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২০— দেগঙ্গা
জয়ী : আনিসুর রহমান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,১১৪
পরাজিত : তরুণকান্তি ঘোষ (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ৪১,৭২৬
জয়ের ব্যবধান : ৫৯,৩৮৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২১— হাড়োয়া
জয়ী : মহম্মদ আবদুল মতিন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৭,৫৯১
পরাজিত : ভাস্কর কুমার মণ্ডল (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ৪১,১৪৪
জয়ের ব্যবধান : ৭৬,৪৪৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২২— মিনাখাঁ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : উষারানি মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯২,০৭৯
পরাজিত : রুদ্রেন্দ্র পাত্র (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ৫৯,৭৮৭
জয়ের ব্যবধান : ৩২,২৯২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২৩— সন্দেশখালি (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : সনৎ সর্দার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,১৮৯
পরাজিত : ঝর্ণা সর্দার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,৬৭৯
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৫১০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২৪— বসিরহাট দক্ষিণ
জয়ী : সুরজিৎ মিত্র (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১২,৯৬৫
পরাজিত : ড. শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ১,০৩,৪২১
জয়ের ব্যবধান : ৯,৫৪৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২৫— বসিরহাট উত্তর
জয়ী : মহম্মদ তৌসেফুর রহমান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,৫০৩
পরাজিত : কৌশিক সিদ্ধার্থ (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ৫৫,২১১
জয়ের ব্যবধান : ৬০,২৯২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২৬— হিঙ্গলগঞ্জ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : রেখা পাত্র (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০০,২০৭
পরাজিত : আনন্দ সরকার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৭৮৬
জয়ের ব্যবধান : ৫,৪২১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২৭— গোসাবা (তপশিলি জাতি)
জয়ী : বিকর্ণ নস্কর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৪৯২
পরাজিত : সুব্রত মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯২,৩৯২
জয়ের ব্যবধান : ১৬,১০০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২৮— বাসন্তী (তপশিলি জাতি)
জয়ী : নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৭,৪৯৫
পরাজিত : বিকাশ সর্দার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭১,৩১৪
জয়ের ব্যবধান : ৫৬,১৮১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১২৯— কুলতলি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : গণেশচন্দ্র মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৬,৪৩৫
পরাজিত : মাধবী মহালদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,১৫৯
জয়ের ব্যবধান : ৫৯,২৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩০— পাথরপ্রতিমা
জয়ী : সমীরকুমার জানা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৭,১৬৪
পরাজিত : অসিতকুমার হালদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১২,২৯১
জয়ের ব্যবধান : ৪,৮৭৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩১— কাকদ্বীপ
জয়ী : দীপঙ্কর জানা (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ১,০৯,৩৭৩
পরাজিত : মন্টুরাম পাখিরা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৬১৩
জয়ের ব্যবধান : ৪,৭৬০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩২— সাগর
জয়ী : সুমন্ত মণ্ডল (বিজেপি) ; প্রাপ্ত ভোট : ১,২৭,৮০২
পরাজিত : বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,৯২১
জয়ের ব্যবধান : ৭,৮৮১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩৩— কুলপি
জয়ী : বর্ণালী ধারা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,২৬৬
পরাজিত : অবনী নস্কর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮০,৮৮৩
জয়ের ব্যবধান : ১০,৩৮৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩৪— রায়দিঘি
জয়ী : তাপস মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৮,৯৯১
পরাজিত : পলাশ রাণা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,০৩৪
জয়ের ব্যবধান : ৫,৯৫৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩৫— মন্দিরবাজার (তপশিলি জাতি)
জয়ী : জয়দেব হালদার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৬৮৬
পরাজিত : মল্লিকা পাইক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,৬৯১
জয়ের ব্যবধান : ১,৯৯৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩৬— জয়নগর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : বিশ্বনাথ দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,১৯৪
পরাজিত : অলোক হালদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮১,৮৪৪
জয়ের ব্যবধান : ২৬,৩৫০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩৭— বারুইপুর পূর্ব (তপশিলি জাতি)
জয়ী : বিভাস সর্দার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২০,৯৮৭
পরাজিত : টুম্পা সর্দার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,১৭২
জয়ের ব্যবধান : ৩১,৮১৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩৮— ক্যানিং পশ্চিম (তপশিলি জাতি)
জয়ী : পরেশ রাম দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২০,৫৪৮
পরাজিত : প্রশান্ত বায়েন (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,৮৮৩
জয়ের ব্যবধান : ৪০,৬৬৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৩৯— ক্যানিং পূর্ব
জয়ী : মহম্মদ বাহারুল ইসলাম (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪৮,৬৮৭
পরাজিত : অসীম সাঁপুই (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ২৮,৫৯৩
জয়ের ব্যবধান : ১,২০,০৯৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪০— বারুইপুর পশ্চিম
জয়ী : বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৭৮১
পরাজিত : বিশ্বজিৎ পাল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,৯১৯
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৮৬২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪১— মগরাহাট পূর্ব (তপশিলি জাতি)
জয়ী : শর্মিষ্ঠা পুরকাইত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৪১২
পরাজিত : উত্তমকুমার বণিক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৮০৫
জয়ের ব্যবধান : ৩১,৬০৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪২— মগরাহাট পশ্চিম
জয়ী : মহম্মদ শামিম আহমেদ মোল্লা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,৮৩৪
পরাজিত : গৌরসুন্দর ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৫,৩৩১
জয়ের ব্যবধান : ৫৮,৫০৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪৩— ডায়মন্ড হারবার
জয়ী : পান্নালাল হালদার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,৩২০
পরাজিত : দীপককুমার হালদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,০৫৪
জয়ের ব্যবধান : ৩১,২৬৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪৪— ফলতা
দেবাংশু পাণ্ডা (বিজেপি)
জাহাঙ্গির খান (তৃণমূল কংগ্রেস)
নির্বাচন অসম্পূর্ণ। আগামী ২১ মে এই আসনে পুনর্নির্বাচন হবে।

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪৫— সাতগাছিয়া
জয়ী : অগ্নীশ্বর নস্কর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১১,০২৩
পরাজিত : সোমাশ্রী বেতাল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১০,৬২২
জয়ের ব্যবধান : ৪০১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪৬— বিষ্ণুপুর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : দিলীপ মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩২,৬৪৭
পরাজিত : অভিজিৎ সর্দার; প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৭২২
জয়ের ব্যবধান : ৩৬,৯২৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪৭— সোনারপুর দক্ষিণ
জয়ী : রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৮,৯৭০
পরাজিত : অরুন্ধতী মৈত্র (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,১৮৮
জয়ের ব্যবধান : ৩৫,৭৮২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪৮— ভাঙড়
জয়ী : মহম্মদ নওশাদ সিদ্দিকি (আইএসএফ); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৬,৫৫৫
পরাজিত : জয়ন্ত গায়েন (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৩০,১৭৭
জয়ের ব্যবধান : ৯৬,৩৭৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৪৯— কসবা
জয়ী : জাভেদ আহমেদ খান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৭,৮৯৩
পরাজিত : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,৯১৯
জয়ের ব্যবধান : ২০,৯৭৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫০— যাদবপুর
জয়ী : শর্বরী মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৬,১৯৯
পরাজিত : দেবব্রত মজুমদার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৮,৪৮৩
জয়ের ব্যবধান : ২৭,৭১৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫১— সোনারপুর উত্তর
জয়ী : দেবাশিস ধর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৯,৮২৪
পরাজিত : ফিরদৌসি বেগম (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ১,১০,০১৭
জয়ের ব্যবধান : ৯,৮০৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫২— টালিগঞ্জ
জয়ী : পাপিয়া অধিকারী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,৪০৭
পরাজিত : অরূপ বিশ্বাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৮২,৩৯৪
জয়ের ব্যবধান : ৬,০১৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫৩— বেহালা পূর্ব
জয়ী : শঙ্কর শিকদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,৫০২
পরাজিত : শুভাশিস চক্রবর্তী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৯০,৩৬৫
জয়ের ব্যবধান : ২৫,১৩৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫৪— বেহালা পশ্চিম
জয়ী : ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,১৭১
পরাজিত : রত্না চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৮৮,৪৭২
জয়ের ব্যবধান : ২৪,৬৯৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫৫— মহেশতলা
জয়ী : শুভাশিস দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৬,৮১১
পরাজিত : তমোনাথ ভৌমিক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৮৩,৮৯৮
জয়ের ব্যবধান : ৩২,৯১৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫৬— বজবজ
জয়ী : অশোককুমার দেব (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৭,০৯১
পরাজিত : ড. তরুণকুমার আদক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৮০,২৪১
জয়ের ব্যবধান : ৪৬,৮৫০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫৭— মেটিয়াবুরুজ
জয়ী : আবদুল খালেক মোল্লা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৪,২৩০
পরাজিত : বীর বাহাদুর সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৩৬,৩৫১
জয়ের ব্যবধান : ৮৭,৮৭৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫৮— কলকাতা বন্দর
জয়ী : ফিরহাদ হাকিম (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,২২৬
পরাজিত : রাকেশ সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৪৫,১৪৬
জয়ের ব্যবধান : ৫৬,০৮০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৫৯— ভবানীপুর
জয়ী : শুভেন্দু অধিকারী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৩,৯১৭
পরাজিত : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৫৮,৮১২
জয়ের ব্যবধান : ১৫,১০৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬০— রাসবিহারী
জয়ী : স্বপন দাশগুপ্ত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৪,১২৩
পরাজিত : দেবাশিস কুমার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৫৩,২৫৮
জয়ের ব্যবধান : ২০,৮৬৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬১— বালিগঞ্জ
জয়ী : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৪৮১
পরাজিত : ড. শতরূপা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৪৭,০০৫
জয়ের ব্যবধান : ৬১,৪৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬২— চৌরঙ্গী
জয়ী : নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৬২,৯৩৮
পরাজিত : সন্তোষ কুমার পাঠক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৪০,৯৩৬
জয়ের ব্যবধান : ২২,০০২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬৩— এন্টালি
জয়ী : সন্দীপন সাহা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৪২৭
পরাজিত : ড. প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৬০,৪২১
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,০০৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬৪— বেলেঘাটা
জয়ী : কুণাল কুমার ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৭৫৭
পরাজিত : পার্থ চৌধুরী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৬৫,১৮১
জয়ের ব্যবধান : ২৮,৫৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬৫— জোড়াসাঁকো
জয়ী : বিজয় ওঝা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫২,৮৬৮
পরাজিত : বিজয় উপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৪৭,০৭১
জয়ের ব্যবধান : ৫,৭৯৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬৬— শ্যামপুকুর
জয়ী : পূর্ণিমা চক্রবর্তী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬০,২৪৮
পরাজিত : ডাঃ শশী পাঁজা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৪৫,৬১৫
জয়ের ব্যবধান : ১৪,৬৩৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬৭— মানিকতলা
জয়ী : তাপস রায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৩৭০
পরাজিত : শ্রেয়া পাণ্ডে (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৬০,২৭৬
জয়ের ব্যবধান : ১৫,৬৪৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬৮— কাশীপুর-বেলগাছিয়া
জয়ী : রীতেশ তিওয়ারি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৮,৩৬৮
পরাজিত : অতীন ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৬৬,৭১৭
জয়ের ব্যবধান : ১,৬৫১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৬৯— বালি
জয়ী : সঞ্জয় কুমার সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৫৭,৬৩৯
পরাজিত : কৈলাস কুমার মিশ্র (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৪৫,৬৪২
জয়ের ব্যবধান : ১১,৯৯৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭০— হাওড়া উত্তর
জয়ী : উমেশ রাই (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৬৭,৫৩৯
পরাজিত : গৌতম চৌধুরী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৫৬,২৮৯
জয়ের ব্যবধান : ১১,২৫০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭১— হাওড়া মধ্য
জয়ী : অরূপ রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৯৪৮
পরাজিত : বিপ্লব কুমার মণ্ডল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৭৯,৮৬৫
জয়ের ব্যবধান : ১৬,০৮৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭২— শিবপুর
জয়ী : রুদ্রনীল ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,৬১৫
পরাজিত : ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৭৩,৫৫৭
জয়ের ব্যবধান : ১৬,০৫৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭৩— হাওড়া দক্ষিণ
জয়ী : নন্দিতা চৌধুরী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০০,৫৪০
পরাজিত : শ্যামল কুমার হাতি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৯২,৭১২
জয়ের ব্যবধান : ৭,৮২৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭৪— সাঁকরাইল (তপশিলি জাতি)
জয়ী : প্রিয়া পাল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৪১২
পরাজিত : বর্ণালী ঢালি নস্কর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৮৮,৬৭২
জয়ের ব্যবধান : ১৬,৭৪০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭৫— পাঁচলা
জয়ী : গুলশন মল্লিক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৩,৯৬৭
পরাজিত : রঞ্জন কুমার পাল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৮৫,৬৪৭
জয়ের ব্যবধান : ৩৮,৩২০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭৬— উলুবেড়িয়া পূর্ব
জয়ী : ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৬৩৩
পরাজিত : রুদ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৮৩,৭৯৫
জয়ের ব্যবধান : ১১,৮৩৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭৭— উলুবেড়িয়া উত্তর (তপশিলি জাতি)
জয়ী : চিরণ বেরা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৩২০
পরাজিত : বিমলকুমার দাস (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৮৯,১৪৩
জয়ের ব্যবধান : ৪,১৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭৮— উলুবেড়িয়া দক্ষিণ
জয়ী : পুলক রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৯,৬৪৯
পরাজিত : স্বামী মঙ্গলানন্দ পুরী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৯২,৪৬২
জয়ের ব্যবধান : ১৭,১৮৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৭৯— শ্যামপুর
জয়ী : ড. হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৫,৬৫১
পরাজিত : নদেবাসী জানা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ১,০৩,৩৯১
জয়ের ব্যবধান : ২২,২৬০

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮০— বাগনান
জয়ী : অরুণাভ সেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,০৬০
পরাজিত : প্রেমাংশু রাণা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট: ৯৩,৭৪৪
জয়ের ব্যবধান : ১১,৩১৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮১— আমতা
জয়ী : অমিত সামন্ত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৬৪৯
পরাজিত: সুকান্ত কুমার পাল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ১,০০,১৯৫
জয়ের ব্যবধান : ৪,৪৫৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮২— উদয়নারায়ণপুর
জয়ী : সমীরকুমার পাঁজা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৮০২
পরাজিত : প্রভাকর পণ্ডিত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৫৭৫
জয়ের ব্যবধান : ১২,২২৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮৩— জগৎবল্লভপুর
জয়ী : অনুপম ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৫,৬০৮
পরাজিত : সুবীর চট্টোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৮,৯৩৭
জয়ের ব্যবধান : ৬,৬৭১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮৪— ডোমজুড়
জয়ী : তাপস মাইতি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৪,০৩৬
পরাজিত : গোবিন্দ হাজরা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,৮৫৯
জয়ের ব্যবধান : ৪২,১৭৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮৫— উত্তরপাড়া
জয়ী : দীপাঞ্জন চক্রবর্তী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮০,৬১২
পরাজিত : শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭০,১৯৭
জয়ের ব্যবধান : ১০,৪১৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮৬— শ্রীরামপুর
জয়ী : ভাস্কর ভট্টাচার্য (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,৬৪৪
পরাজিত : তন্ময় ঘোষ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৬,৯৫৯
জয়ের ব্যবধান : ৮,৬৮৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮৭— চাঁপদানি
জয়ী : দিলীপ সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৩,৭০৪
পরাজিত : অরিন্দম গুঁই (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯০,৬৭৮
জয়ের ব্যবধান : ৩,০২৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮৮— সিঙ্গুর
জয়ী : অরূপকুমার দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,০০৮
পরাজিত : বেচারাম মান্না (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,৫৭০
জয়ের ব্যবধান : ২১,৪৩৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৮৯— চন্দননগর
জয়ী : দীপাঞ্জনকুমার গুহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,২৭৩
পরাজিত : ইন্দ্রনীল সেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭২,৮৩২
জয়ের ব্যবধান : ১৩,৪৪১

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯০— চুঁচুড়া
জয়ী : সুবীর নাগ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৭,৭০৪
পরাজিত : দেবাংশু ভট্টাচার্য (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,২৬৯
জয়ের ব্যবধান : ৪৩,৪৩৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯১— বলাগড় (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সুমনা সরকার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৫,৬২৪
পরাজিত : রঞ্জন ধারা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৩,৭১০
জয়ের ব্যবধান : ৪১,৯১৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯২— পাণ্ডুয়া
জয়ী : তুষারকুমার মজুমদার (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,৩৪৯
পরাজিত : সমীর চক্রবর্তী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৬,১২১
জয়ের ব্যবধান : ৫,২২৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯৩— সপ্তগ্রাম
জয়ী : স্বরাজ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০২,৪১৪
পরাজিত : বিদেশ রঞ্জন বসু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৭৯,১২৫
জয়ের ব্যবধান : ২৩,২৮৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯৪— চণ্ডীতলা
জয়ী : স্বাতী খন্দকার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,১৪৩
পরাজিত : দেবাশিস মুখোপাধ্যায় (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৭,৪৮০
জয়ের ব্যবধান : ১৯,৬৬৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯৫— জাঙ্গিপাড়া
জয়ী : প্রসেনজিৎ বাগ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০২,৪০৯
পরাজিত : স্নেহাশিস চক্রবর্তী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,৫৪৭
জয়ের ব্যবধান : ৮৬২

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯৬— হরিপাল
জয়ী : মধুমিতা ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,৩৩২
পরাজিত : ডাঃ করবী মান্না (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৯,৮৪৪
জয়ের ব্যবধান : ৩,৪৮৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯৭— ধনেখালি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : অসীমা পাত্র (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৩,৪৬২
পরাজিত : বর্ণালী দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১০,৪০৫
জয়ের ব্যবধান : ১৩,০৫৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯৮— তারকেশ্বর
জয়ী : সন্তু পান (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৬,৯০১
পরাজিত : রমেন্দু সিংহ রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,৯০২
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৯৯৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ১৯৯— পুরশুড়া
জয়ী : বিমান ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৮,৮২১
পরাজিত : পার্থ হাজারী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৫,৩৬৮
জয়ের ব্যবধান : ৫৩,৪৫৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০০— আরামবাগ (তপশিলি জাতি)
জয়ী : হেমন্ত বাগ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৩,০০০
পরাজিত : মিতা বাগ (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,০৪১
জয়ের ব্যবধান : ২৮,৯৫৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০১— গোঘাট (তপশিলি জাতি)
জয়ী : প্রশান্ত দিগর (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৪,৪৯৮
পরাজিত : ডাঃ নির্মল মাজি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৪,৯১৬
জয়ের ব্যবধান : ৪৯,৫৮২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০২— খানাকুল
জয়ী : সুশান্ত ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৬,৭২৯
পরাজিত : পলাশ কুমার রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯২,২৪৬
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,৪৮৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০৩— তমলুক
জয়ী : হরেকৃষ্ণ বেরা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৬,৫৬৬
পরাজিত : দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০১,৮৩৭
জয়ের ব্যবধান : ৩৪,৭২৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০৪— পাঁশকুড়া পূর্ব
জয়ী : সুব্রত মাইতি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৯,২৬৪
পরাজিত : অসীমকুমার মাজি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯১,৩৬১
জয়ের ব্যবধান : ১৭,৯০৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০৫— পাঁশকুড়া পশ্চিম
জয়ী : সিন্টু সেনাপতি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩৭,৯১৯
পরাজিত : সিরাজ খান (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ১,০৫,৩৫২
জয়ের ব্যবধান : ৩২,৫৬৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০৬— ময়না
জয়ী : অশোক দিন্দা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৭,১৬৬
পরাজিত : চন্দন মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ১,১০,৯২৫
জয়ের ব্যবধান : ১৬,২৪১

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০৭— নন্দকুমার
জয়ী : নির্মল খাঁড়া (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩১,৪৭৬
পরাজিত : সুকুমার দে (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ১,০০,৮৭৩
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৬০৩

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০৮— মহিষাদল
জয়ী : সুভাষচন্দ্র পাঁজা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২১,৫৮৪
পরাজিত : তিলককুমার চক্রবর্তী (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৩৪৬
জয়ের ব্যবধান : ২৬,২৩৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২০৯— হলদিয়া (তপশিলি জাতি)
জয়ী : প্রদীপকুমার বিজলী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩২,১৮৩
পরাজিত : তাপসী মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট: ৮৩,১২১
জয়ের ব্যবধান : ৪৯,০৬২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১০— নন্দীগ্রাম
জয়ী : শুভেন্দু অধিকারী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৭,৩০১
পরাজিত : পবিত্র কর (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৭,৬৩৬
জয়ের ব্যবধান : ৯,৬৬৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১১— চণ্ডীপুর
জয়ী : ড. পীযূষকান্তি দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৬,০৪৭
পরাজিত : উত্তম বারিক (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৭৭৭
জয়ের ব্যবধান : ২০,২৭০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১২— পটাশপুর
জয়ী : তপন মাইতি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৬,৫৮৯
পরাজিত : পীযূষকান্তি পাণ্ডা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৭,৫৩৮
জয়ের ব্যবধান : ৯,০৫১

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১৩— কাঁথি উত্তর
জয়ী : সুমিতা সিংহ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩০,০৮৮
পরাজিত : দেবাশিস ভূঁইয়া (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১০,০৩৩
জয়ের ব্যবধান : ২০,০৫৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১৪— ভগবানপুর
জয়ী : শান্তনু প্রামাণিক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩০,৫৮৬
পরাজিত : মানবকুমার পড়ুয়া (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৯,৭০৮
জয়ের ব্যবধান : ২০,৮৭৮

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১৫— খেজুরি (তপশিলি জাতি)
জয়ী : সুব্রত পাইক (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৯,৮৭৫
পরাজিত : রবীনচন্দ্র মণ্ডল (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,১৮৫
জয়ের ব্যবধান : ৩২,৬৯০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১৬— কাঁথি দক্ষিণ
জয়ী : অরূপকুমার দাস (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৮,২১৯
পরাজিত : তরুণকুমার জানা (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৬,৭৪৭
জয়ের ব্যবধান : ৩১,৪৭২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১৭— রামনগর
জয়ী : ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৩১,৮০৮
পরাজিত : অখিল গিরি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৪,৮৬৯
জয়ের ব্যবধান : ২৬,৯৩৯

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১৮— এগরা
জয়ী : দিব্যেন্দু অধিকারী (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,৪২,৬৭০
পরাজিত : তরুণকুমার মাইতি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৬,৯৭৮
জয়ের ব্যবধান : ২৫,৬৯২

বিধানসভা কেন্দ্র : ২১৯— দাঁতন
জয়ী : অজিতকুমার জানা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১০,২৫৯
পরাজিত : মানিক মাইতি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৯,৮৮৩
জয়ের ব্যবধান : ১০,৩৭৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২০— নয়াগ্রাম (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : অমিয় কিস্কু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,০০,৬৫৭
পরাজিত : দুলাল মুর্মু (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৪,৪৩৩
জয়ের ব্যবধান : ৬,৪২৪

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২১— গোপীবল্লভপুর
জয়ী : রাজেশ মাহাত (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৪,৬৮৩
পরাজিত : অজিত মাহাত (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮৮,০০৮
জয়ের ব্যবধান : ২৬,৬৭৫

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২২— ঝাড়গ্রাম
জয়ী : লক্ষ্মীকান্ত সাহু (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২০,৮৭৭
পরাজিত : মঙ্গল সরেন (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৮২,৭৩০
জয়ের ব্যবধান : ৩৮,১৪৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২৩— কেশিয়ারি (তপশিলি উপজাতি)
জয়ী : ভদ্র হেমব্রম (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৩,৭১৩
পরাজিত : রামজীবন মাণ্ডি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৭,৮২৬
জয়ের ব্যবধান : ১৫,৮৮৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২৪— খড়্গপুর সদর
জয়ী : দিলীপ ঘোষ (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৮৯,৮৮৫
পরাজিত : প্রদীপ সরকার (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৫৯,৩৭৯
জয়ের ব্যবধান : ৩০,৫০৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২৫— নারায়ণগড়
জয়ী : রমাপ্রসাদ গিরি (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৬,০৫০
পরাজিত : প্রতিভা রানি মাইতি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৬৮৩
জয়ের ব্যবধান : ২০,৩৬৭

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২৬— সবং
জয়ী : অমল কুমার পণ্ডা (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৭,৭৮৩
পরাজিত : মানস রঞ্জন ভূঁইয়া (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,১৬,৬৪৭
জয়ের ব্যবধান : ১১,১৩৬

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২৭— পিংলা
জয়ী : স্বাগতা মান্না (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ১,২৪,১৮৯
পরাজিত : অজিত মাইতি (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ১,০৫,৭০৯
জয়ের ব্যবধান : ১৮,৪৮০

বিধানসভা কেন্দ্র : ২২৮— খড়্গপুর
জয়ী : দীনেন রায় (তৃণমূল); প্রাপ্ত ভোট : ৯৮,৩২০
পরাজিত : তপন ভূঁইয়া (বিজেপি); প্রাপ্ত ভোট : ৯৫,৪৪৮
জয়ের ব্যবধান : ২,৮৭২ *(ক্রমশঃ)*

গান ধরলেন নজরুল—

পায়ের কাছে লাঠি রাখে লেঠেল

নন্দলাল ভট্টাচার্য

এ এক আশ্চর্য সমাপাতন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ শেষ হবার মুখে কাজি নজরুল মুক্তি পেলেন। মেয়াদ শেষের এক মাস আগে রাজদ্রোহের অভিযোগে সশ্রম সাজা খাটা কবি নজরুল ছাড়া পেলেন ইংরেজ সরকারের জেলখানা থেকে।

লড়াই ফেরত হাবিলদার কাজি নজরুল চলে এলেন কলকাতায়। সাহিত্য হলো তাঁর জীবন ও জীবিকা। কবি হিসেবে সাড়া জাগিয়েছেন কলকাতায় আসার প্রথমলগ্ন থেকেই। রবীন্দ্রনাথ তখনও বাংলা সাহিত্যের আকাশে হিরণ্যদ্যুতি সবিতার মতোই জ্যোতির্ময়। সেই আলোকিত জ্যোতিতে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন নজরুল। ধীরে ধীরে বিচ্ছুরিত হতে থাকে তাঁর প্রতিভার বিভা। এক বৈপ্লবিক চেতনার পান্নার মতোই সবুজ তখন নজরুল। শুরু নানা ক্ষেত্রে বিচরণ।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় ভেঙে দেওয়া হলো বাঙ্গালি পল্টন। প্রথম মহাযুদ্ধে জয়ী পক্ষের ব্রিটেন তখন অহংবোধে স্ফীত। সেই বোধ থেকেই সম্ভবত তাদের কাছে বাঙ্গালি পল্টন এক বাড়তি বোঝা। ভারমুক্ত হওয়ার জন্যই পল্টনের জওয়ানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করেই বেকার করে ছিল সকলকে। কর্মচ্যুত নজরুলের বেঁচে থাকার উপায় তখন সাহিত্যসেবা।

সেই সেবা পর্বে নজরুল নিজের আদর্শকে যথাযথ ভাবে প্রকাশের জন্যই বের করলেন সাপ্তাহিক 'ধুমকেতু', কলকাতায় আসার দু' বছরের মাথায়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে 'ধুমকেতু'-র আত্মপ্রকাশ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট, বঙ্গাব্দের ১৩২৯ শ্রাবণ মাসে। কাগজের 'সারথি' নজরুল। হ্যাঁ, সম্পাদকের পরিবর্তে এই 'সারথি' শব্দটি ব্যবহার করে এক নতুনের পথ খুললেন তিনি।

'ধূমকেত'-কে কেন্দ্র করে বিভাষিত হতে থাকে নজরুলের বৈপ্লবিক ভাবনার নানা দিক। কবি নিজে লিখতে থাকেন নানা বিষয়ে প্রতিটি সংখ্যাতেই। রক্তগরম করা সেইসব লেখা। অবশ্য তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করতে থাকেন মুজফফর আহমেদ এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা লিখতেন যথাক্রমে 'দ্বৈপায়ন' ও 'ত্রিশূল' ছদ্মনামে। সরকারের সমালোচনা এবং বিপ্লবের কথা ছিল ওইসব লেখায়। ফলে বিশেষকরে তরুণদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'ধূমকেতু'।

প্রাথমিকভাবে সরকার তেমন নজর না দিলেও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'ধমকেতু' পূজাসংখ্যায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমন' কবিতাটিকে রাজদ্রোহমূলক বলে অভিযোগ করে মামলা দায়ের করে সরকার। ওই মামলায় তৎকালীন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো ১৯২৩-এর আট জানুয়ারি রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুলকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শাস্তি হয় এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নজরুল কিছুদিন বিশেষ কয়েদির মর্যাদায় আটক থাকেন। এরপরেই তাঁকে প্রথমে বহরমপুর, পরে হুগলী জেলা কারাগারে সাধারণ কয়েদি হিসেবে আটক রাখা হয়। সে সম্পর্কে নজরুল লেখেন, 'হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকলরকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়ছিল। সেইসময় সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।'

নজরুলের ওই পাশাটি হলো হুগলীর জেলসুপার আর্সটনকে উত্যক্ত করার জন্য লেখা একটি প্যারোডি। আর্সটলের গলার আওয়াজ ছিল অত্যন্ত কর্কশ। তাই নজরুল তাঁর নাম দেন 'হর্সটোন'। তাঁকে চটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটির প্যারোডি করে লেখেন 'সুইপার বন্দনা'—

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারই গান তোমারই ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে,
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয় ডোরে—
তুমি ধন্য ধন্য হে। ...ইত্যাদি

এই গানটিরই ফুটনোটে নজরুল ওপরের ওই কথাগুলি লিখেছিলেন।

হুগলী জেলে থাকার সময় নজরুল এবং তাঁর সহবন্দিরা একবার অনশন করতে বাধ্য হন। জেলের নানা অব্যবস্থা, ইংরেজ কর্মচারীদের নানা অত্যাচার, খারাপ খাবার দেওয়া ইত্যাদির প্রতিবাদে শুরু হয় ওই

অনশন।

হুগলী জেল কেন, ইংরেজের প্রায় প্রতিটি জেলেই কারাবন্দিদের সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হতো। সাধারণ কয়েদিদের তো মানুষ বলেই মনে করা হতো না। রাজনৈতিক কারণে যাঁদের আটক রাখা হতো তাঁদের সঙ্গে প্রাথমিক একটা ভদ্রতার ভাব দেখালেও সুযোগ পেলেই চরম অভদ্রতা শুধু নয়, নির্মম অত্যাচারও চলতো।। কোনো কোনো জেল সুপার বা জেলার তো সব সময়ই মারমুখো হয়ে থাকত। বেশিরভাগ সময়েই এক ধরনের আতঙ্কেই চুপচাপ থাকতেন বন্দিরা।

নজরুল হুগলী জেলে এসেছিলেন অনেকটা ঝড়ো হাওয়ার মতো। হাসি-গান-হুল্লোড়ে সহবন্দিদের মাতিয়ে রাখতেন। একইসঙ্গে ইংরেজ জেলকর্তাদের নিয়ে চলত নানা রসিকতা। তাঁদের ওই কাণ্ডকারখানা একরকম সহ্য করতে বাধ্যই হতো জেলকর্তারা। কিন্তু সেইসঙ্গে নিত্যনতুন ফন্দি এঁটে বন্দিদের জীবনকে দুঃসহ করে তোলার চেষ্টা হতো। নানা ধরনের নির্যাতন তো বটেই, সেই সঙ্গে অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার দিত, জেল কর্তৃপক্ষ।

রসনায়ক নজরুল এবার রুদ্র। তাঁরই নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেল অনশন। খবরটা বাইরে আসতেই আলোড়ন। উদ্রেক তো বটেই। নজরুলকে অনশন প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানানো শুরু হলো। এমনকী তাঁর মা এসেও অনুরোধ করলেন। কিন্তু নজরুল সিদ্ধান্তে অনড়। জেল-ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই। আইন কারাবন্দিদের যেসব সুযোগ দিতে বলেছে, তা না দেওয়া পর্যন্ত অনশন চলবেই।

একদিন-দু'দিন করে অনশন ৩৯ দিনে পৌঁছল। উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ বললেন— নজরুল, বাংলা সাহিত্য তোমাকে চায়। ভারি প্রয়োজন তোমাকে। অনুরোধ করছি অনশন ভাঙতে। একই অনুরোধ করেন দেশবন্ধুও। কবির ওই অনুরোধ আর ফেরাতে পারলেন না নজরুল। অনশন ভাঙলেন ওই ৩৯ দিনের দিন।

নির্দিষ্ট সময়ের একমাস আগেই কারামুক্তি ঘটল নজরুলের। ১৯২৩ তখন পা দিয়েছে ১৯২৪-এর ঘরে। এই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের বছরটা কেবল নজরুল নয়, বঙ্গরাজনীতির ক্ষেত্রেও বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠল। এই ১৯২৪-এর ২৪ এপ্রিল নজরুল বিয়ে করলেন আশালতা সেনগুপ্তকে। নজরুল ঘরনি হয়ে আশালতা হলেন প্রমীলা। তাঁকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন চুঁচড়া শহরের মোগলটুলি লেনে। সাহিত্য সেবাই তখন তাঁর জীবনযাপনের রসদ জোগাচ্ছে। এই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনেও হয়ে উঠল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক অর্থবহ বছর। বঙ্গরাজনীতিতে কেন, ভারতেই যে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তাই প্রশাসনে দেশবন্ধু তাই 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নীতি প্রয়োগে তৎপর হয়ে উঠলেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। কিন্তু দমলেন না দেশবন্ধু। তিনি, স্বরাজ্য দল এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ওই চুক্তি কার্যকর করতে প্রায় বদ্ধপরিকর। ১৯২৪-এর মে-জুনে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে অনুমোদিত হলো দেশবন্ধুর ওই প্রস্তাব। দেশবন্ধু সেই অনুমোদন হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর স্বপ্নসম্ভব বেঙ্গল প্যাক্ট রূপায়ণে।

ওই ১৯২৪ সালেই ঘটল আরও একটি বড়ো ঘটনা। তারকেশ্বর মন্দিরের তৎকালীন মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির অপসারণ চেয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা পরিচালনারও দায়িত্ব নিল দেশবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস। সিরাজগঞ্জ অধিবেশনেই তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ শুরুর প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। আর তারপরই শুরু হয় জোর প্রস্তুতি।

তারকেশ্বর মন্দিরের মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে মহাবীর দল নামে এক অরাজনৈতিক সংগঠন। দলের প্রতিষ্ঠাতা নেতারা হলেন স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে দুই সাধু। দুজনেরই রয়েছে পঞ্জাবে অকালি দলের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা। দুই সন্ন্যাসীর মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দর পূর্ব নাম রসুল সিংহ। লক্ষ্ণৌয়ের অধিবাসী ছিলেন তিনি। ব্যারিস্টারি করতেন। আসানসোলে শ্রমিক আন্দোলনও করতেন। তারপর সন্ন্যাস এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু।

স্বামী সচ্চিদানন্দর পূর্বনাম ভোলা মিশ্র। পঞ্জাবের অকালি দলের আন্দোলনের তিনিও ছিলেন এক সক্রিয় কর্মী। পঞ্জাবের পর তিনি এবং বিশ্বানন্দ মহাবীর দল গঠন করে তারকেশ্বর তীর্থ সংস্কারে তীব্র ভাবে ঝাপিয়ে পড়েন ১৯২৪-এর গোড়া থেকে। অবশ্য আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দেই। মোহান্তের দুর্নীতি, অনাচার এবং চারিত্রিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনে তৎপর হন তাঁরা। আর প্রথম থেকে একাজে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাহায্য কেবল নয়, নেতৃত্বও চান তাঁরা। ঠিক করেন ২০ মে থেকে তাঁরা শুরু করবেন সত্যাগ্রহ।

দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা আসেন তারকেশ্বরে। সেখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে সিদ্ধান্তে আসেন, অবস্থা অগ্নিগর্ভ। কংগ্রেসকে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হবে। সিরাজগঞ্জের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়ার আগেই দেশবন্ধু এই আন্দোলনের জন্য কাজকর্ম শুরু করে দেন।

প্রথম থেকেই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বিপ্লবীনেতা ধরানাথ ভট্টাচার্য, সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধু এই আন্দোলনের কর্মসূচি প্রচার ও জনমত সংগঠনের ওপর বিশেষ জোর দেন। আর তার জন্য একজন প্রচার সচিবের প্রয়োজন অনুভব করেন তাঁরা। প্রাথমিক আলোচনার পর তাঁরা তিনজনই এই কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে নজরুলকে নির্বাচিত করেন। নজরুল ধরানাথ ভট্টাচার্যের পূর্ব পরিচিত এবং প্রায় বন্ধু, দেশবন্ধুর অত্যন্ত স্নেহভাজন এবং সুভাষচন্দ্রের তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত।

নজরুলকে জানানো হলো। নজরুল রাজি। দেশবন্ধুদের প্রচারের কথা জন্য একটি সঙ্গীত রচনায় হাত দিলেন তিনি। সেটাই হবে আন্দোলনের প্রাণের গীতি বা থিম সং এমনটাই তাঁদের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছার মর্যাদা রাখার জন্যই নজরুল লিখে ফেললেন 'মোহন্তর মোহঅন্তর গান'। সুরও দিলেন। গাইলেনও নিজে।

তারকেশ্বরের তৎকালীন মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির পাপাচারের উল্লেখ করে নজরুল লিখলেন এক দীর্ঘ গীতি। আখ্যান বা তথ্যমূলক গীতিময় রয়েছে মোট ৪৩টি পঙক্তি। বিষয় অনুযায়ী মোট আবার কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত —

জাগো আজ দণ্ডহাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।

ঐ ডুবালো পাপচণ্ডাল তোদের বাংলাদেশের কাশী।
জাগো বঙ্গবাসী।।
তোরা হত্যা দিতিস যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে।
ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপনি আসি'
জাগো বঙ্গবাসী।।
মোহের যার নাইকো অন্ত
পুজারি সেই মোহন্ত মা-বোনের সর্বস্বান্ত,
করছে বেদীমূলে।
তোদের পূজার প্রসাদ বলে খাওয়ায় পাপপুঁজ সে গুলে
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস পাপ ব্যাভিচার রাশিরাশি।
জাগো বঙ্গবাসী।।

পরের স্তবকে রয়েছে ভণ্ড-তপস্বী মোহান্তের ছলে বলে কৌশলে অর্থ সংগ্রহের কথা—

পুণ্যের ব্যবসাদারী
চালায় সব এই ব্যাপারি
জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হয়ে ছাই মেখে যে ভিখারী-শিব বেড়ান ভিক্ষা করে।
ওরে তাঁর পূজারি দিনে দিনে ফুলে হচ্ছে খোদার খাসি।
জাগো বঙ্গবাসী।।

মোহান্ত দুশ্চরিত্র তবুও তাঁরই কাছে আশীর্বাদ চাইতে গিয়ে যারা ঘরের ইজ্জতও বিকিয়ে দেয় তাদের সাবধান করে লেখা হয়,

এইসব ধর্ম ঘাগি
দেবতায় করেছে দাগী;
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নককে বসে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেবদেউলে প'শে
আর তোরা পূজিস তারেই? জোগাস খোরাক সেবাদাসী,
জাগো বঙ্গবাসী।।

এই ভাবে পরের স্তবকগুলিতে মোহান্তের নানা অসৎ গুণের উল্লেখ সেই মোহান্তের উৎখাতের অন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে নজরুল লেখেন—

দিয়ে নিজ রক্তবিন্দু—
ভরালি পাপের সিন্ধু
ডুবলি তায় ডুবলি হিন্দু, ডুবালি দেবতারে।
দ্যাখ ভোগের বিষ্ঠা পুড়ছে তোদের বেদীর ধূপাধারে।
পূজারির কমণ্ডলুর গঙ্গাজলে মদের ফেনা উঠছে ভাসি।
জাগো বঙ্গবাসী।।
দিতে যায় পূজা আরতি
সতীত্ব হারায় সতী
পুণ্য খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে।
তার ভোগ মহলে জ্বলছে প্রদীপ তোদের পুণ্য ঘিয়ে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামিতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।
জাগো বঙ্গবাসী।।
তোরা সব শক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি।
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যে রে।
তোরা পূজারিকে করিস পূজা, পূজার ঠাকুর ছেড়ে।
মা-র অসুর শোধরা সে ভুল, আদেশ দেন মা সর্বনাশী।
'জয় তারকেশ্বর' বলে পড়বি রে নয় গলায় ফাঁসি।
জাগো বঙ্গবাসী।।

গানটি সংকলিত হয়েছে নজরুলের 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থে। ১৯২৪-এর আগস্ট মাসে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটিকে কিন্তু সে বছর নভেম্বর মাসেই বাজোয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ করে ইংরেজ সরকার।

গানটি নজরুল সম্ভবত লিখেছিলেন ১৯২৪-এর নভেম্বর মাসে। কংগ্রেস-নেতৃত্ব সত্যাগ্রহ শুরুর আগে ৩০ মে তারকেশ্বর মন্দির-মাঠে ডাকা হয় এক জনসভা। উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ এবং অন্যান্যরা। উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে 'জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী' বলে।' তারপরই ঘটল অবিস্মরণীয় ঘটনা। সে কথা লিখে রেখে গেছেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবী নজরুল-বান্ধব প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল' বই-তে। (দ্র: পৃ. ৯৩)।

ওই বই থেকে জানা যায় সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। মন্দির মাঠের ওই জনসভা বানচাল করার জন্য মঞ্চের কাছেই রয়েছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির লেঠেল বাহিনীর এক সর্দার ও দুর্দান্ত লাঠিয়াল। নির্মম। মারকুটেও। কানুনের তোয়াক্কা না করে কতজনকে যে ঘায়েল করেছে তার কোনো হিসেব নেই। এহেন সর্দারের নেতৃত্বে হাজির বেশ কিছু লেঠেল। ইঙ্গিত পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের রুদ্র রূপ দেখে মঞ্চের নেতারা ও জনতা উদ্বিগ্ন। আতঙ্কিত।

নজরুল গাইছেন। দেশবন্ধু মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছেন সত্য ব্যানার্জির দিকে। গান শুনতে শুনতে সত্য ব্যানার্জির নাসারন্ধ্র ফুলছে। উদ্বেগ বাড়ছে নেতাদের। কিছুটা দিশাহারা লেঠেলরাও। কই, সর্দার তো নির্দেশ দিচ্ছে না!

নজরুলের কিন্তু কোনোদিকে নজর নেই। গাইছেন তিনি আপন মেজাজে। গান শুনতে শুনতে মানুষ উদ্দীপিত। কিছুটা-বা উত্তেজিত। এক ধরনের সংকল্পে দৃঢ় হচ্ছে জনতা।

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে লেঠেলদের। সর্দারের ইঙ্গিত না পেয়ে ক্রোধে নিশপিশ করছে তাদের হাতা আর সত্য ব্যানার্জি অপলক। নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়েই চলছে।

এক সময় গান থামে। সকলে অবাক হয়ে দেখে, মঞ্চে উঠে পড়েছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, কাজী আবার গাও।'

আবার গান ধরলেন নজরুল। 'নজরুলের কণ্ঠের দৃঢ়তায় সুর দ্বিগুণ হয়ে উঠল। লাঠিয়ালরা হতবাক। গান শেষ হলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুল ও দেশবন্ধুর পায়ের কাছে নিজের হাতের লাঠি রেখে ওই সভায় মোহান্তের সর্বনাশের শপথ নিলেন। আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল, বেশিরভাগ লাঠিয়াল নিয়ে সদ্যবাবু বাল্মীকির মতো সত্যাগ্রহে শামিল হয়।' (প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, ওই, পৃ. ৯৯।

সেদিন এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হলো জনতা। একইসঙ্গে তারকেশ্বরে মোহান্ত-বিরোধী আন্দোলন পেল এক নতুন মাত্রা। সেইসঙ্গে সুনিশ্চিত হয়ে গেল মোহান্ত সতীশচন্দ্র গিরির পতনের মুহূর্ত। আর সেই মুহূর্ত সৃষ্টির অন্যতম স্থপতি হয়ে রইলেন বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম। □

অন্ধকার ভেদ করা এক আলোর শিখা

সাবিত্রীবাঈ ফুলে

বন্দনা বিশ্বাস

সাবিত্রীবাঈ ফুলে শুধুমাত্র একটি মহিলা বা নারীর নাম নয়, এক আন্দোলনের নাম, এক বিপ্লবের নাম। তিনি হলেন ভারতের প্রথম নারী শিক্ষিকা, নারীশিক্ষার অগ্রদূত এবং সমাজসংস্কারের এক অমর প্রতীক। ১৮৩১ সালের ৩ জানুয়ারি, মহারাষ্ট্রের নাইগাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মাত্র ৯ বছর বয়সেই তাঁর বিবাহ হয় প্রখ্যাত সমাজসংস্কারক ১৩ বছর বয়সি জ্যোতিরাও ফুলে-এর সঙ্গে। সেই সময়ে নারীশিক্ষা ছিল সমাজে নিষিদ্ধ। নারীদের শুধু গৃহকর্মে সীমাবদ্ধ রাখা হতো। কিন্তু জ্যোতিরাও উপলব্ধি করেছিলেন— সমাজের উন্নতি সম্ভব নয় যদি নারীরা অশিক্ষিত থাকে। তাই তিনিই প্রথম তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাঈকে শিক্ষিত করে তোলেন। স্বামীর উৎসাহে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন, আর সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের এক ঐতিহাসিক যাত্রা।

১৮৪৮ সালে, পুনে শহরের ভিড়েওয়াড়ায় সাবিত্রীবাঈ ও জ্যোতিরাও ফুলে প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের প্রথম মেয়েদের বিদ্যালয়। সাবিত্রীবাঈ নিজে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। সেই সময়ে এটি ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রথমে মাত্র ৯ জন ছাত্রী ছিল। সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি থামেননি। যেখানে সমাজের সকল শ্রেণীর মেয়েরা পড়াশোনা করতো। যে সমাজে নারীর বাইরে বেরোনোই ছিল অপরাধের মতো, সেখানে তিনি বই হাতে বিদ্যালয়ে যাচ্ছেন সমাজের উল্টো পথে হেঁটে, মেয়েদের স্কুলে পড়ানোর জন্য। প্রতিদিন তাঁকে অপমান, কটূক্তি, এমনকী কাদা ও গোবর নিক্ষেপের মতো অপমান সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। অতিরিক্ত একটি শাড়ি সঙ্গে নিয়ে বের হতেন, বিদ্যালয়ে পৌঁছে তা বদলে নিয়ে পাঠদান করতেন।

এই দৃশ্য কেবল এক নারীর সংগ্রামের নয়, এটি এক অন্ধ মানসিকতার বিরুদ্ধে এক সাহসী প্রতিবাদ। সাবিত্রীবাঈ শুধু উচ্চবর্ণের মেয়েদের শিক্ষাই চাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন— শিক্ষা সমাজের সকলের জন্মগত অধিকার। তাই অবহেলিত সমাজের শিশুদের জন্যও বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫১ সালের মধ্যে ফুলে দম্পতি ১৮টিরও বেশি বিদ্যালয় পরিচালনা করছিলেন। তাঁদের এই কাজ সমাজের উচ্চবর্ণের একাংশকে ক্ষুব্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁরা থামেননি। সেই সময়ে বিধবাদের জীবন ছিল অসহনীয়। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, নারীর উপর অত্যাচার— সবই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ।

এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন সাবিত্রীবাঈ। তিনি বিধবাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ থেকে রক্ষা পেতে 'বালহত্যা প্রতিরোধ গৃহ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৩ সালে জ্যোতিরাও ফুলে প্রতিষ্ঠা করেন সত্যশোধক সমাজ। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা এবং সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা। জ্যোতিরাওয়ের মৃত্যুর পর সাবিত্রীবাঈ নিজেই সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, যা সে সময়ে ছিল অভূতপূর্ব।

সাবিত্রীবাঈ শুধু শিক্ষিকা নন, তিনি ছিলেন এক কবি ও চিন্তাবিদ। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কাব্যফুলে' এবং 'বভনকাশী সুবোধ রত্নাকর'-এ তিনি শিক্ষা, আত্মমর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়ের কথা বলেছেন।

তিনি বলেছিলেন, 'শিক্ষা গ্রহণ করো, আত্মবিশ্বাসী হও, সংগ্রাম করো।' এই বার্তা আজও ভারতবাসীর কাছে প্রাসঙ্গিক । ১৮৯৭ সালে পুনেতে প্লেগ মহামারী দেখা দিলে তিনি আক্রান্ত মানুষদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এক অসুস্থ শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি নিজেই সংক্রমিত হন। ১০ মার্চ ১৮৯৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন।

আজ আমরা নারীশিক্ষা, নারীস্বাধীনতা, লিঙ্গসমতা নিয়ে কথা বলি। কিন্তু ভাবতে হবে যে, এই পথ কে তৈরি করেছিলেন? আজকের আধুনিক ভারতের নারীশিক্ষার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন সাবিত্রীবাঈ ফুলে। তাঁর সাহস আমাদের শেখায় যে, অন্যায়ের সামনে মাথা নত করা যাবে না। শিক্ষাই মুক্তির একমাত্র পথ। সমাজ পরিবর্তন শুরু হয় তাঁর দেখানো পথেই। সাবিত্রীবাঈ ফুলে কোনো সাধারণ নারী নন। তিনি এক যুগের বিবেক। তিনি দেখিয়েছেন— একজন শিক্ষিতা নারী কেবল নিজের জীবন নয়, একটি সমাজের ভাগ্য বদলে দিতে পারেন। আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যদি সত্যিই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে চাই, তবে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে— কোনো মেয়ে যেন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থাকে, কোনো মানুষ যেন জাতি বা লিঙ্গের কারণে অবহেলিত না হয়। শিক্ষাই শক্তি, সমতাই মানবতার ভিত্তি। সাবিত্রীবাঈ ফুলের আদর্শ আমাদের পথ দেখাক, আমাদের সমাজকে আরও ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক করে তুলুক।

সাবিত্রীবাঈ ফুলে শুধু ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক নন, তিনি মারাঠি সাহিত্যের প্রথম আধুনিক মহিলা কবি হিসেবেও স্বীকৃত। তাঁর কবিতা সরল ভাষায় লেখা হলেও গভীর সমাজ-সচেতনতা, বিপ্লবী চেতনা ও নারী জাগরণের বার্তা বহন করে। তিনি লোকায়ত ছন্দ (যেমন অভঙ্গ, ওভি, শ্লোক) ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। □

কবি ও বিপ্লবী হৃদয়ের মহামিলন রবীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী

সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

১৯২৪ সালে চীন ভ্রমণ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে এলেন। জাপানে কবি আতিথ্য গ্রহণ করেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বাড়িতে। সহকারী ড. কালিদাস নাগ বলেছেন, '১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাবেন শুনেই, যেন তাঁর অগ্রজ পি এন ঠাকুরের ছদ্মনামে পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে রাসবিহারী গেলেন জাপানে। সেসব গল্প তিনিই হাসতে হাসতে কবিগুরুকে ও আমাদের শুনিয়েছেন ১৯২৪ সালে। যখন আমরা চীন পরিক্রমা শেষ করে জাপান যাই।'

রাসবিহারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের সূচনার আগেই ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সুরেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। এই দুই ভাইয়ের কাছে আসতেন সংবাদদাতারা। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই ছিল এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আর তিনি এদের গগনেন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসতেন। গগনেন্দ্রনাথ এদের লুকিয়ে লুকিয়ে চাঁদা দিয়েছেন। বিপ্লবের তহবিলে গোপনে সাহায্য করেছেন। বারীন ঘোষ এসেছেন, উল্লাসকর এসেছেন। খুব সম্ভব রাসবিহারী বসু এবং অরবিন্দ ঘোষও এসেছেন...'।

মুরারিপুকুর তল্লাশিতে রাসবিহারীর দু'টি চিঠি পুলিশের জিম্মায় চলে যাবার দরুন তাঁর বিপদ ঘনিয়ে আসে। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, তাঁকে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে সোদপুরের শরদিন্দু (শশীভূষণ রায়চৌধুরী) এবং যুগান্তরের লেখককর্মী প্রেমতোষ বসু পরামর্শ করেন। তার ফলে শশীভূষণ রায় প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর গৃহশিক্ষকের পদটি খালি করে রাসবিহারীকে দেন এবং রাসবিহারী ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে দেরাদুনে চলে যান। এই প্রফুল্লনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় হলেও এঁরা ছিলেন ভিন্ন বাড়ি তে। তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড রাজভক্ত, আদবকায়দায় ব্রিটিশ অনুগামী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার এদের উপর প্রসন্ন ছিলেন না, তা সত্ত্বেও দুই পরিবারের যাতায়াত ছিল। পুলিশ অফিসারেরা প্রায়ই যাতায়াত করতেন থানা থেকেও ওই বাড়িতে। তাই পুলিশবিভাগের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তাঁরা মন্তব্য করেছেন; 'Rashbehari– however– was not at this time under any suspicion...'

দেরাদুনে যাওয়ার পর রাসবিহারী বেশিদিন ঠাকুর-পরিবারে আশ্রিত থাকেননি। তিনি ফরেস্টের চাকরি জোগাড় করেছিলেন সেখানকার ইম্পিরিয়াল ফরেস্ট ইনস্টিটিউটে। বছর দুয়েক বাদে আবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপ্লবের কাজে। ১৯১০ সালে লাহোরে এসে বসবার দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেন। ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে নদীয়া জেলা থেকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে আসেন বসন্ত বিশ্বাসকে। উদ্দেশ্য তাকে বোমা নিক্ষেপের শিক্ষাদান। পরের বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে গেলেন বসন্ত। ১৯১২ সালের শেষদিকে বোমাটি এল চন্দননগর থেকে। বোমাটি নাকি তৈরি করেছিলেন অরবিন্দ দত্ত ও

তাঁর সহকারী ছিলেন অনুকূল হাজরা। আবার অন্য মতে ওই বোমাটি তৈরি করেছিলেন বোমাবিশারদ মণীন্দ্রনাথ নায়েক এবং কলকাতায় এটিকে রাসবিহারীর হাতে তুলে দেন জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ। ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর ওই বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর।

হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের কাজটি রাসবিহারীর জীবনে একটি বড়ো মাপের কাজ। এই কাজে স্বদেশি ও প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হয়। তাঁরা উৎসাহিত হলেও রাসবিহারী রবীন্দ্রনাথের সমর্থন পাননি। তিনি তখন ছিলেন সুদূর আমেরিকার ইলিনয় অঙ্গরাজ্যে। তাঁর পক্ষে জানার কথা নয় যে, কে ওই বোমা নিক্ষেপ করেছিল। মিসেস ও মিস কেনেডি হত্যা (ক্ষুদ্রায়তকৃত) সংবাদে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তৎকালীন গভর্নরের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এই সংবাদ পেয়ে তিনি কোনো টেলিগ্রাম পাঠাননি। শান্তিনিকেতনে জগদানন্দ রায়কে লেখা একটি পত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। নীচে ওই চিঠিটির অংশ উদ্ধৃত করা হলো—

508W. High Street Urbana
Illinois– USA.
১০ পৌষ, ১৩১১
জগদানন্দ,

কাল হইতে সকালে খবরের কাগজে পড়া গেল দিল্লিতে হার্ডিঞ্জের উপর কে একজন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। পড়ে আমার মনটা অত্যন্ত শীতিত হয়েছে। আমরা মনে করি পাপকেই আমাদের কাজে লাগাব, কাজ তো গোড়ায় যায় তারপর সেই পাপটাকে সামলাই কে? এ যে চালুনিতে করে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা। পৃথিবীতে যারা সদুপায়ে অর্থ উপার্জন করাটাকে বিলক্ষণক ও কষ্টসাধ্য মনে করে তারাই সিঁধ কেটে বড় মানুষ হতে চায়। আমাদের হতভাগ্য দেশে আমরা যথার্থ ত্যাগ স্বীকার করতে কষ্ট বোধ করি বলেই আমাদের ওখানেই একলা বীরপুরুষ বোমা ছুঁড়ে দেশ উদ্ধার করতে চায়। এই বোমা কোনখানে গিয়ে পড়ে বল দেখি? একেবারে স্বদেশের সকলভাগ্যের উপরে। আমাদের দেশে দুর্গতি তো নানা আকারেই বিরাজ করছে, তার উপরে আবার এই শয়তানটাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দিল কে? একে তো সহজে বিদায় করতে পারবে না। এখন থেকে ক্ষণে ক্ষণে অকস্মাৎ কোন অন্ধকার থেকে এ হঠাৎ আমাদের উপরে এসে পড়ে আমাদের ভাগ্য কপালকে আরো ভাঙবে...।

হার্ডিঞ্জের সঙ্গে কবির যথেষ্ট পরিচয় ছিল তা জগদানন্দকে লেখা একটি পত্রে জানা যায়। হার্ডিঞ্জ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং লেখা নিয়ে বক্তব্যের অনুরোধ তিনি মানেননি। এই বড়লাট উত্তরকালে কবিকে নাইট উপাধি দেওয়ার জন্য যথার্থ সুপারিশ করেছিলেন।

ঘটনা এগিয়ে চলে আপনগতিতে। রাসবিহারী পলাতক এবং কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। নলিনীকিশোর গুপ্ত লিখেছেন, ''রবীন্দ্রনাথের আর্বনায় শোভাবাজার ও শ্রীদাম মুদী লেনে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে যে সকল কথাবার্তা হয় তাহা কলিকাতার গোপন কেন্দ্রে রাসবিহারীকে সবিস্তারে বলা হইলে তিনি রবি সেন ও লেখককে বলেন; 'এইজন্য ভীত হইবার কোনো হেতু নাই।' ইহা বলিয়া রবীন্দ্রনাথের গানটি উদ্ধৃত করেন।''

'ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে
আসবে সবাই আপন সেজে
এক সঙ্গে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।'

এবার বিদেশ অর্থাৎ জাপানযাত্রা। দু'টি উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন। এক, রাসবিহারী নিজেই লিখেছেন; 'অস্ত্র সম্পর্কে আমরা দেশীয় সৈনিকদের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। কাজেই, তাহারা যখন ধরা পড়িল তখন আমরা আর কিছুই করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে যাহাতে সৈন্যদের প্রত্যক্ষ সাহায্য না পাইয়াও আমরা কার্য করিতে পারি সেইজন্য arms and ammunition বিদেশ হইতে না আনিলে নয়। আমার ইচ্ছা ছিল যে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পূর্বে দেশটাকে small arms দ্বারা ছাইয়া ফেলিব। সেই উদ্দেশ্যে আমি বিদেশ যাইবার স্থির করি। দুই, দেশেতে সে পর্যন্ত এই experience অনুভব করিয়াছিলাম যে চুরি ডাকাতির দ্বারা বিপ্লবের টাকা যোগাড় হইবে না। তাহাছাড়া ২/৪ জন লোক ছাড়া কোনো ধনীই আমাদের কাজে টাকা দিবে না, সেইজন্য বিদেশ হইতে টাকা যোগাড় করা।'

সহকর্মী নলিনীমোহনকে রাসবিহারী সম্বোধন করতেন 'বাঙ্গাল' বলে। এই নলিনীমোহন লিখেছেন, 'ঠিক এই সময় এক সংবাদ প্রচারিত হইল যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শীঘ্রই জাপানে যাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সংবাদ দেখিয়া রাসবিহারীর মনে একটা বুদ্ধি বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন যে তিনি পি এন ঠাকুর এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া পর্যটক সেজে জাপান যাইবেন; রবীন্দ্রের জাপান ভ্রমণের কার্যসূচি প্রণয়ন, তাহার আদর আপ্যায়ন, অভ্যর্থনা ও অপরাপর প্রাথমিক কার্যের দায়িত্ব লইয়া। এইভাবে কাজ করিলে ছাড়পত্র সংগ্রহে কোনো বেগ পাইতে হইবে না। তবে এই ব্যাপারে স্বয়ং কবিগুরুর একটি লিখিত অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হইবে। অতএব কবিবরকে বুঝাইতে হইবে যে তিনি কবির দূত হিসাবে জাপানে যাইয়া তাহার জাপান পরিদর্শনের পথ সুগম করিবেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে বুঝাইয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ করা হইল। এখন আর ছাড়পত্র করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।..... গিরিজাবাবু (নগেন্দ্রনাথ দত্ত) তখন ধরা পড়েন নাই। কাজেই রাসবিহারীর জাপান যাত্রার সমুদয় ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অর্থাদি সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য তিনিই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।'

জাপানযাত্রা সম্পর্কে রাসবিহারীর নিজস্ব ভাষ্য কী ছিল এবার তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, 'এখন প্রথম কাজ হইল টিকিট কাটা। সেই সময় সংবাদপত্রে দেখিলাম যে কবি রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই খবর পড়িয়াই মাথায় একটা বুদ্ধি জাগিল। শচীকে (শচীন সান্যাল) বলিলাম যে পি এন টেগোর এই নামে একখানি জাপানের টিকিট কেন। দেরাদুনে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের একটি Villa আছে। সেখানে থাকার সময় ইহার নাম শুনিয়াছিলাম। Poet Tagore-এর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এইভাবে পরিচয় দিলে ইংরেজ ইহাকে সন্দেহ করিতে পারিবে না। কারণ কবি তখন জাপান যাইবেন এই কথা সর্বসাধারণে বাহির হইয়াছে। ইংরেজ মনে করিবে রবীন্দ্রনাথ নিজে জাপান যাইবেন বলিয়া হইতে একটু আগে জাপানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি যেমন ভাবিয়াছিলাম ইহাও ঠিক তাই। তাঁর বিবরণে আরও জানা যায় যে, টিকিটটা কেটেছিলেন শচীন সান্যাল। এই প্রসঙ্গে বিবরণটির আরও একটু উদ্ধৃত করা যেতে পারে 'Steward আসিয়া বলিল যে, খাবার জন্য প্রত্যেকদিন সাড়ে তিন টাকা খরচ পড়িবে। ভাবিয়া দেখিলাম যে কোবে পৌঁছতে একমাস লাগে, তাহলে খাবার জন্যই আমার একশত টাকার বেশি লাগিবে। With food প্রথম শ্রেণীর টিকিটের দাম মোট ২২১। কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটখানি (এটি ৮০ টাকায় খরিদ করিয়াছিলাম)-সহ আহার প্রথম শ্রেণী করিয়া বদল করিলাম। ১৯১৫ সালের মে মাস ১২ তারিখ এই দিন সীমানা ছাড়িল।'

রাসবিহারী এখন প্রিয়নাথ ঠাকুর। এইসময়ে মোট তিনবার রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ উঠেছিল। তাঁর নিজের বিবরণ এইরকম, 'Pursur-কে আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে আমি একজন ছাত্র, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছি। আমার নাম Tagore

দেখিয়া সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে রবিবাবুর কোনো সম্পর্ক আছে কি না। আমি বলিলাম যে দূর সম্পর্ক আছে, তবে একই বংশ, এখন আলাদা আছি। আমি যে ঠাকুর বংশের লোক এই জানিয়া Pursur খুব আনন্দিত। Dr. Tagore সম্পর্কে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিল এবং আমিও তার যথাযথ উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় বিবরণটি তাহারই ভাষায়, এমন সময় দেখি কেবলমাত্র একজন সাহেব পুলিশ অফিসার আমাদের অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কেবিনের দিকে আসিতেছে এবং অপর সকলে নীচে অপেক্ষা করিতেছে। সাহেবটি ডাইনিং রুমে আসিলেই Captain ও Pursur তাহাকে পূর্বের ভদ্রলোকের মতন হুইস্কি ও সিগার দিয়া অভ্যর্থনা করিল। তারপর তাহাকে যাত্রীদের একটা তালিকা দিল। প্রথম শ্রেণীর আরোহীদের মধ্যে আমি এবং আর একজন ভারতবাসী। আমাদের সম্বন্ধে Pursur-কে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল সে একজন বণিক এবং অপরটি অর্থাৎ (আমি) Tagore Family-র লোক, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছে। সাহেব এতেই একেবারে সন্তুষ্ট। তৃতীয় বিবরণটি এইরকম— আমাদের লইয়া একখানি লঞ্চ Customs office-এর সামনে গিয়া থামিল। আমার তোরঙ্গটা পাশে Customs office লইয়া যাইতেই Customs officer-টি বাহিরে আসিয়া আমায় নমস্কার করিয়া ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমিই কি Mr. Tagore? আমি বলিলাম যে আমি টেগোর এবং কিছু পূর্বে সানফ্রান্সিস্কো মার্ক হইতে নামিয়াছি। এই কথা শুনিয়াই তিনি বলিলেন, আপনার জন্য আমেরিকা হইতে কতকগুলি পত্র আসিয়াছে, সেগুলি আমাদের অফিসে আছে, এখানেই আনাইয়া দিয়াছি। একটু আশ্চর্য হইলাম... হঠাৎ মনে পড়িল। কবিবন্ধু Tagore-এর এখানে আসিবার কথা ছিল। এই সমস্ত পত্র তাহারই। আমি অফিসারটিকে বলিলাম যে পত্রের উপর লেখা পুরা নামটা কী? তিনি বলিলেন যে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করিয়া সে সংবাদটি অপর অফিস হইতে লইবেন। আমি যা ভাবিয়াছিলাম তাহাই। পত্রের ঠিকানা Dr. Rabindranath Tagore। Customs officer-কে বলিলাম যে পত্রগুলি Poet Tagore-এর, আমার নয়। আমার নাম P.N. Tagore। তিনি ভুল করিয়াছেন বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। কবির নামেই একটি ম্যাজিক সৃষ্টি হয় এবং রাসবিহারী এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জাপানের কোবে শহরে তিনি পৌঁছিয়াছিলেন ৭ জুন, এরপর ট্রেন ধরিয়া তিনি কিয়োটোতে চলিয়া যান। সেইখানে Tagore উচ্চারণটি বাতিল করিয়া Thakur করেন। এরপর টোকিয়োতে গমন। লাজপত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ। বার্লিন কমিটির হেরম্ব গুপ্তের সান্নিধ্য। বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী কিমুরার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই কিমুরার সঙ্গে ছিল রবীন্দ্রনাথেরও পরিচয়। ১৯১৬ সালে কবি প্রথম বার এলেন জাপানে। ততদিনে ব্রিটিশ পুলিশ খবর পাইয়াছে রাসবিহারী জাপানে। এই সময় রাসবিহারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় কি না জানা না গেলেও কবির সহযাত্রী শিল্পী মুকুল দে একটি তথ্য জানান। কবি ও তার সঙ্গীরা উঠিয়াছিলেন শিল্পী টাইকমনের বাড়িতে। পথে-ঘাটে এক ভদ্রলোক তাদের কাছে মাঝেমধ্যেই কবির খবর নিতেন। পরে মুকুল দে জানান তিনিই রাসবিহারী।

রাসবিহারী বন্ধু শ্রীশ ঘোষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখিতেন। ১৯২৩ সালে জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপদে পড়েন রাসবিহারী। তাঁর বাড়ি ভেঙে পড়ে। নিঃস্ব প্রায় রাসবিহারী অর্থসাহায্যের জন্য শ্রীশ ঘোষকে চিঠি লেখেন। তিনি রাসবিহারীর চিঠি খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেশবাসীর কাছে অর্থসাহায্য চাইলেন। কাগজে ছাপিয়ে দেশবাসীর কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। এ ছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের জন্য লিখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও তদানীন্তন বঙ্গের কংগ্রেস কমিটিকে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে জাপান সাহায্য ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ সর্বসমেত ৬২১ টাকা শ্রীশচন্দ্রের কাছে পাঠাইয়া দেন এবং তা রাসবিহারীর কাছে পাঠানো হয়।

১৯২৪ সাল। দ্বিতীয় বার রবীন্দ্রনাথ জাপান গিয়াছিলেন। কোজু নামে একটি শহর থেকে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে ৭ জুন টোকিয়ো এলেন। টোকিও স্টেশনে জনসমুদ্র। সকলে কবির দর্শনেচ্ছু। চেষ্টা করিতেছেন। ট্রেনের দরজার সামনে ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। হিন্দুস্থানি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, কিছু বিদেশি এবং কিছু জাপানি। মালা ও ফুল ছড়াছড়ি যাইতেছে স্টেশনে। হিন্দুস্থানি অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মি. আর. বি. বসু (রাসবিহারী বসু) ট্রেনের দরজা খুলে জনতার দিকে হাত দেখাতেই উপস্থিত জনতা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠলো বানজাই, বানজাই। মি. বোস ট্রেন থেকে নামলেন, তার ঠিক পিছনেই ছিলেন বৃদ্ধ দার্শনিক, ড. টেগোরের দীর্ঘ দেহ দেখা দিল দরজা জুড়ে। তাঁর দীর্ঘ চুল খেলা করছিল কাঁধের কাছে। দীর্ঘ দাড়ি নেমে এসেছে বুক অবধি... একবার তিনি ভালো করে দেখলেন জনতার দিকে। হাতদুটো জোড়া হয়ে এল বুকের কাছে। সেই মুহূর্তেই আবার আওয়াজ উঠল বানজাই, বানজাই। বিভ্রান্ত করে বললেন। বন্ধুগণ, না, স্মিত হাসি ছাড়া আর কিছু বলা হলো না।

তিনি নামলেন প্ল্যাটফর্মে। লোকজন ঘিরে ধরেছে। গলাবন্ধ হচ্ছে পুলিশ। এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন ড. টেগোর। বারে বারেই তাঁকে থামতে হলো সংবাদদাতা, ফোটোগ্রাফার এবং

অনুরাগীদের উৎপাতে। সকলেই তাঁর হাতের স্পর্শ পেতে চায়... জনতা তাঁকে পৌঁছে দিল স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমাণ মোটর গাড়ি পর্যন্ত। ড. টেগোর গাড়িতে উঠে হাত নাড়লেন। আবার আওয়াজ উঠল বানজাই। গাড়ি চলতে শুরু করল মি. তাজিমার বাড়ি ১০ নং নাকা মেগুরোর দিকে। সঙ্গে ছিলেন এল. কে. এলমহার্স্ট, তিনি এই সফরে ছিলেন কবির সেক্রেটারি। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ড. ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু এবং ড. কালিদাস নাগ।

কবির এই সফরে রাসবিহারীর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল কিন্তু কী আলোচনা হয়েছিল তার খুব-একটা বেশি বিবরণ পাওয়া যায় না। ওই সময়ে রাসবিহারী ও সবরেওয়ালের সঙ্গে তোলা ছবি আছে। কবির সঙ্গে চীন ও জাপান সফরের একটি ডায়েরি (কবির সঙ্গে একশো দিন) রেখেছিলেন ড. কালিদাস নাগ, সেখানে রাসবিহারী প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় ঘটনাটি অদ্ভুত। এই ড. নাগ প্রখ্যাত এক বিপ্লবী রচিত পুস্তকের ভূমিকায় অল্প করে উল্লেখ করেছেন, '১৯১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান যাবেন শুনেই তাঁর আত্মীয় পি. এন. টেগোর ছদ্মনামের পাসপোর্ট ইত্যাদি নিয়ে রাসবিহারী গেলেন জাপানে। সে গল্প তিনিই অর্থাৎ রাসবিহারীঞ্চ হাসতে হাসতে কবিগুরুকে ও আমাদের শুনিয়েছেন ১৯২৪ সালে যখন আমরা চীন পরিক্রমা শেষ করে জাপান যাই।' এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ গোপনে হয়নি, প্রকাশ্যেই হয়েছিল। সুতরাং শ্রী মজুমদারের বক্তব্য সঠিক নয়। রাসবিহারীর জাপান যাত্রা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুমিতি যে তথ্য নলিনীমোহন দিয়েছিলেন এবং তা ইতিপূর্বেই আলোচিত। ড. নাগের এই বক্তব্যে নলিনীমোহনের দেওয়া তথ্যকে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। এরা প্রাক্তন বিপ্লবীর স্মৃতিবিভ্রম। রাসবিহারী ও তাঁর পুত্রের সঙ্গে ছবি তুলেছেন কবি। এই সময় ২০ জুন তিনি ওরিয়েন্টাল হোটেলে ভারতীয়দের একটি সভায় বক্তৃতা দেন। হিন্দুস্থানী অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাসবিহারী সে সভায় উপস্থিত ছিলেন এটা আশা করা যায়। কবি সেখানে বলেছিলেন, একটা জাতের প্রাণের মধ্য দিয়ে তাকে বিচার করা উচিত, তবেই তার সত্য প্রাণের সন্ধান মিলবে। বাইরে থেকে সমালোচনা করতে গেলে সত্যকেই হারাতে হয়; মানুষ মেলে না। ভারতবাসীদের এ কথা মনে রেখে আত্মসম্মান ও সহানুভূতি সমানভাবে জাগ্রত রেখে বিশ্বমানবের যজ্ঞে আসতে হবে। এই সময় পর্যন্ত দেখা যায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে কবি এবং বিপ্লবী দু-জনেই তাঁদের পুরোমাত্রায় অটল ছিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠের স্নেহ ও কনিষ্ঠের শ্রদ্ধার মধ্যে কোনও তারতম্য ছিল না। ১৯২৯ সালের ৭ জুন কবি আবার এসেছিলেন জাপানে এবং ভারতবর্ষীয়দের সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। ওই বছরের ২৮ মার্চ খবরে প্রকাশ যে ২৪ মার্চ রবীন্দ্রনাথ কোবে শহরে এসেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে মোট ন'জন সদস্যের একটি অভ্যর্থনা-সমিতি তৈরি হয়েছে এবং কবিকে অভ্যর্থনার জন্য তারা তৈরি ইত্যাদি। রাসবিহারীর পক্ষে এই সময়টা ছিল খুব খারাপ, কেননা ১৯২৫ সালে তিনি হারিয়েছেন তাঁর সহধর্মিণী তোশিকোকে।

যাই হোক, সেই সময়ে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটতে হয়েছিল কিন্তু আলোচনার কোনও বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

বিশ্বভারতীর উন্নতির জন্য জাপান থেকে রবীন্দ্রনাথ অর্থসংগ্রহ করেছিলেন। সেই সুবাদে বিশ্বভারতীর উপর নজর পড়েছিল রাসবিহারীর। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রসংযোগ সৃষ্টি হয়। প্রথম পত্রটি ছিল বিশ্বভারতীতে একটি নিয়োগ সংক্রান্ত। অবশ্য এরও আগে চিঠি দিয়েছিলেন কবি, কিন্তু সে পত্রটি পাওয়া যায় না। রাসবিহারীর চিঠিটি বিস্তৃতভাবে নীচে দেওয়া হলো—

Rashbehari Bose

79 ON DEX Aoyama
July 15, 1930
Tokyo– Japan
To
Dr. Rabindranath Tagore
India

My dear Gurudeva–

I received your kind letter in due time and thank you for the same.

At present Japan is suffering from a severe economic depression and consequently there is little prospect of securing the two proposed scholarships for sometime to come or rather till condition improves appreciably.

My sister in law (Miss Makiko Hoshi– my wife's maternal uncle's daughter) knows flower arrangements embroidery and Japanese tea ceremony– as I already wrote you. Moreover– she is a graduate of Tokyo Women's University.Would it not be possible for you to engage her as a teacher of these arts in Santiniketan? She does not want any salary– but she wants that her boarding and lodging expenses be borne by the University– and in lieu of these she will teach the arts to the students of Santiniketan. Of course– she will herself bear her passage and pocket and other expenses. If you are prepared to engage her on that condition– that is the Santiniketan University will bear her boarding and lodging expenses in lieu of that she will teach those arts to the students– will you kindly send a cable to me to that effect– so that she may start for India with Mrs. Tagagaki in September next.

Two Santiniketan art students– Messers– Biswarup Bose and Hari Haran reached Tokyo last month. Two Japanese gentlemen have been kind enough to bear their boarding and lodging expenses for three years.

With Pronams
Yours faithfully
Sd. Rashbehari Bose

Sir–

I am a sister in law (that is Mrs. Bose's maternal Uncle's daughter) of Mr. Rashbehari Bose. Through his introduction I met you at Mr. Okura's office when you were kind enough to say that you would help me in every way if I went to your University. Since then I have been studying Sanscrit– flower arrangement– tea ceremony and embroidery. I hope to become efficient to a certain extent in the latter three by the end of the year and then I wish to come to your university and be of some use to the Indian girl students. At the same time I should be glad if you would be kind enough to help me study Indian Philosophy and Sanscrit. I do not remember whether I told you during your stay here that I graduated from the Tokyo's women's University last year.

An early reply will much oblige. With best regards

Yours faithfully

Sd.

Makiko Hoshi

কবি মাকিকো হোশির চিঠি না পেলেও তাতে তাঁর কোনও অসুবিধা ঘটেনি। তিনি শেষপর্যন্ত শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং ফিরে গিয়ে কবিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষাটা তেমন ভালো জানতেন না। এর পরের চিঠিটিতে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়েছে। '

Dear Gurudeva–

I think you are quite well after my

leaving India. I am offering to you my heartful thanks for your kindness that you gave me a Japanese girl. Santiniketan is my home in India. My short life in Santiniketan was light as a dream– and a heartful picture who was painted in my mind and heart. I am very sorry for that I could not do anything for India during I was there. But I am thinking of that I would be able to do something for India in Japan– till I may go to there. Now I am staying in my own house with parents– sister and ... Having found me among them– they are quite happy. Mr. R. B. Bose and his father and mother in law are quite well– and they are thinking of India to get her independence.

I hope your noble long life and good effects of Santiniketan institution. Please accept my faithful Namaskar to you.

Yours faithfully

Sd. Makiko Hoshi

এইভাবে কবির সঙ্গে রাসবিহারীর একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আবার চীন-জাপান যুদ্ধের সময় দু-জনের মধ্যে মতবিরোধ হয়, তবে রাজনৈতিক মতবিরোধ ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ককে নষ্ট করতে পারেনি।

দ্রুত বদলে যাওয়া সময়ে জাপান সম্পর্কে ভারতের রাজনৈতিক মতের বদল হয়। ভারতের নেতৃবৃন্দের সহানুভূতি ছিল চীনের দিকে।

10.10.1937

Dear Rashebehari–

Your Cable caused me many restless hours– for it hurts me very much to have to ignore your appeal. I wish you had asked for my co-operation in a cause against which my spirit did not protest. I know– in making an appeal you counted on my great regard for the Japanese– for– I– along with the rest of Asia– did once admire and look up to Japan and did once fondly hope that in Japan Asia had at least discovered its challenge to the west– that Japan's new strength would be consecrated in safeguarding the culture of the east against alien interests. But Japan has not taken long to betray that rising hope and repudiate all that seemed significant in her wonderful– and– to us symbolic– awakening– and has now become itself a worse menace to the defenseless people of the east– worse than its economic exploitation– worse indeed than its geographical aggression– is this daily perpetration of pitiless massacres and its unashamed championship of its humanity. Countries have been conquered before in history– and seen in wider perspective– there is nothing very inhuman or shocking in a virile race overstepping the dilapidated fences built by the previous victories of an early race— and until science had made man's inhumanity so effective– such fighting– like all life– seemed only half cruel. All that is changed– and today when one nation invades another– its wrong is not only that of mere imperialist ambition– but of human butchery more indiscriminate than any plague. And if the outraged conscience all over the world cries out against such a wrong– who am I to recall such righteous protest? This protest has not been engineered by any single individual– it is as spontaneous and heartfelt as the admiration that the peoples of the East felt for Japan thirty years ago. I should be powerless to check it even if I dared to attempt it.

রাসবিহারী বসুর রামায়ণ ও গীতা অনুবাদের কথা শুনে উৎসাহিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় মানবতার অমূল্য সম্পদ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে নিহিত আছে তাকেই বিশ্ব মানবের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এইখানেই কবি ও বিপ্লবী হৃদয়ের মহামিলন।

You must therefore forgive me that I am unable to oblige you– and believe me when I say that I have great sympathy with my countrymen in Japan– as indeed I have with the Japanese themselves— but the cry that comes from China of broken hearts and broken heads and broken bones is far too piercing and awful.

With kind regards–

Yours faithfully

Yours sincerely

Sd. Rabindranath Tagore

রাসবিহারী বসুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘ পত্র দিয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দো-জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশন কবিকে একটি মানপত্র-সহ কিছু স্মারক পাঠিয়ে দেয়। এই সম্পর্কে তাদের দেওয়া কোনো চিঠির হদিশ পাওয়া যায় না। রাসবিহারীর সঙ্গে কবির মনোমালিন্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অচিরেই দুজনের সম্পর্ক আবার নতুন গতি পেয়েছিল। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসারে মনোনিবেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক লেখা যেমন তিনি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, তার পাশাপাশি গীতা ও রামায়ণকে জাপানের মানুষের কাছে তুলে ধরবার জন্য এই দুটি গ্রন্থেরও জাপানি ভাষায় তিনি অনুবাদ করার কাজ করছিলেন। রাসবিহারী বসুর রামায়ণ ও গীতা অনুবাদের কথা শুনে উৎসাহিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় মানবতার অমূল্য সম্পদ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে নিহিত আছে তাকেই বিশ্ব মানবের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এইখানেই কবি ও বিপ্লবী হৃদয়ের মহামিলন। □

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

ধানগাছে রুপোর মতো মূল্যবান ধাতু

এও কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। আইআইটি মাদ্রাজের গবেষকরা পরীক্ষানিরীক্ষা করে এটি প্রমাণ করেছেন।

প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে বিভিন্ন ধাতু মিশে থাকে। মূলের সাহায্যে উদ্ভিদ যে খাদ্যরস শোষণ করে, তার মধ্যে ধাতব লবণ ও বিভিন্ন মৌল থাকে। এই উপাদানের সবকটি উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। অথচ খাদ্যরস শোষণের চাপে অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলিও চলে আসে। আমরা যেমন নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন নিই আর কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমাদের নাসিকা ছিদ্রে কোনো ফিল্টার রাখা নেই যে আমরা বাতাসে থাকা বিভিন্ন গ্যাসগুলির মধ্যে কেবল অক্সিজেনই বেছে নেব। তাই নিঃশ্বাসের সঙ্গে চলে আসে সবই। তার মধ্যে আমাদের শরীর অক্সিজেনকে কাজে লাগায়। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া ক্ষতিকারক। বাতাসে কোনো বিষাক্ত উপাদান থাকলে মৃত্যুও হতে পারে। যে কারণে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

মাটি থেকে টেনে নেওয়া খাদ্যরস থেকেই উদ্ভিদ বিভিন্ন ধাতু সঞ্চয় করে। ধাতু সঞ্চয়ের ক্ষমতা কোনো উদ্ভিদের বেশি, কোনো উদ্ভিদের কম। ধানগাছের এই ক্ষমতা কেমন তা পরীক্ষা করার জন্য বিজ্ঞানীরা বেছে নিয়েছিলেন ৫০৫ রকমের ধানের প্রজাতি। তার মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন ৯টি প্রজাতির সন্ধান পেয়েছেন যেগুলি এবিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় 'গরিবশাল' নামের একটি বিশেষ জাতের ধানচাষের প্রচলন ছিল। সেই ধানের গাছের রুপো সঞ্চয়ের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। এই প্রজাতির ধানগাছ প্রতি কেজি ধানে ১৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত রুপো সঞ্চয় করার ক্ষমতা রাখে। এমনকী যেখানে প্রাকৃতিকভাবে প্রতি কেজি মাটিতে মাত্র ০.০১ মিলিগ্রাম রুপো থাকতে পারে, সেখানেও প্রতি কেজি ধানে ০.২০ মিলিগ্রাম রুপো পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন হলো, এই ধানের চাল খাওয়া কি নিরাপদ?

রুপো বেশি জমা হয় ধানের খোসায় বা তুষে। ভালোভাবে পালিশ করা চালে এইসব ধাতু সংক্রমণের ভয় থাকে না।

ধানচাষের মাধ্যমে কি বাণিজ্যিকভাবে রুপো উৎপাদন সম্ভব?

তাও সম্ভব। যে উৎস থেকে সহজে ও সুলভে ধাতু নিষ্কাশণ সম্ভব হয়, সেখান থেকে সম্ভব। তাই আগামীদিনে এই বিকল্পটিও হাতে থাকছে।

অজয় ভট্টাচার্য

জাতীয় উদ্যান

বোরিবালি

মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বই উত্তরাংশের উপনগরী বোরিবালিতে অবস্থিত সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান একটি বৃহৎ সংরক্ষিত উদ্যান। উদ্যানটির আয়তন ৮৭ বর্গকিলোমিটার। এই উদ্যানের ভেতরে ২৪০০ বছরের পুরনো কানহেরি গুহা রয়েছে। এই গুহায় পাথরে খোদাই বৌদ্ধ স্থাপত্য শোভা পাচ্ছে। এখানে বাঘ, সিংহ, চিতাবাঘ, বানর-সহ ৪০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৭০ প্রজাতির পাখি , ১৫০ প্রজাতির প্রজাপতি এবং ৩৮ প্রজাতির সরীসৃপ বাস করে। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দর্শনার্থীরা সুবিন্যস্ত বনপথ ধরে সাইকেল চালিয়ে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। এই উদ্যান দর্শনের সেরা সময় জুন থেকে ফেব্রুয়ারি মাস। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত খোলা থোকে। সোমবার বন্ধ থাকে। টিকিটের মূল্য প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৮৫ টাকা এবং ৫ বছরের জন্য ৪৫ টাকা।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১৩

অস্তু
(ঠিক আছে)

কৃপয়া জলং দদাতু।
দয়া করে জল দিন।
অস্তু দদামি।
ঠিক আছে, দিচ্ছি।
কৃপয়া গীতং গায়তু।
দয়া করে একটি গান করুন।
অস্তু গায়ামি।
ঠিক আছে, গাইছি।

অস্তু খাদামি।
অস্তু লিখামি।
অস্তু আগচ্ছামি।
অস্তু তিষ্ঠামি।
(**অস্তু** দ্বারা কয়েকটি বাক্য রচনা করবো)

ভালো কথা

নববর্ষে তুহিনা প্রকাশনীতে

এবার বাংলা নববর্ষের দিন সন্ধায় আমি মা-বাবার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে তুহিনা প্রকাশনীতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন স্বস্তিকার সুকেশদা, চিত্তদা, বালুরঘাটের প্রবীরদা। আমরা যখন পৌঁছলাম, তার আগে থেকেই ওখানে বেশ কয়েকজন লেখক, প্রকাশক এবং স্বামীজীর বাড়ির দুজন সন্ন্যাসী মহারাজ ছিলেন। আমরা সবাইকে নমস্কার এবং সন্ন্যাসী মহারাজদের প্রণাম করলাম। একজন সন্ন্যাসী মহারাজ একটি ঠাকুরের গান গাইলেন। তারপর সবার সঙ্গে পরিচয় হলো। আমি দুটি আবৃত্তি করলাম। দুটি সুভাষিতম্ ও একটি গীতার শ্লোক বললাম। তুহিনা প্রকাশনীর কর্ণধার হিমাংশুবাবু খুশি হয়ে আমাকে উত্তরীয়, ক্যালেন্ডার, কলম ও শংসাপত্র ১ প্যাকেট মিষ্টি এবং 'গোপাল ভাঁড় সমগ্র' বই উপহার দিলেন। সন্ন্যাসী দুজন আমাকে আশীর্বাদ করলেন।

দীপমাল্য সাউ, ষষ্ঠশ্রেণী, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৬

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন অ ম ব	(১) ধি বি ণ আ র চ
(২) থ ন্ধু অ ব	(২) ত নি আ জ ঘা ত

১১ মে সংখ্যার উত্তর
(১) কূটকৌশল (২) কোকিলকণ্ঠ

১১ মে সংখ্যার উত্তর
(১) কুমড়োপটাশ (২) কুলপুরোহিত

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (২) কুহেলি বিশ্বাস, কালিবাড়ি, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০। (৩) নীলাক্ষ পাণিগ্রাহী, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা। (৪) রাম লাহিড়ী, কলকাতা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

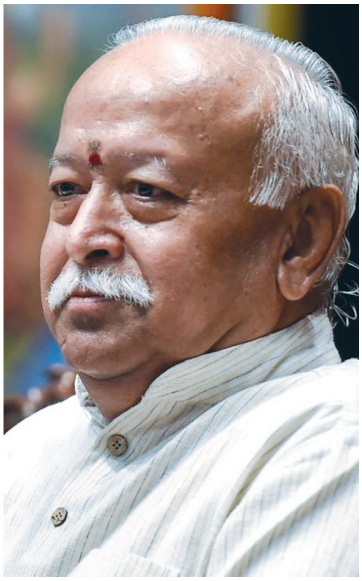

সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা...

স্বামী যুক্তানন্দ

তারিখ সঠিক মনে নেই, তবে সালটা ২০১১ হবে। আর মাসটা হবে নভেম্বর। কলকাতা শহরে এসেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দুই পূজ্য সরসঙ্ঘচালক। একজন সদ্য পূর্বতন, অন্যজন বর্তমান। নাম দু'টি সর্বজন পরিচিত। প্রথমজন হলেন, কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন এবং দ্বিতীয়জন হলেন শ্রীমোহনরাও ভাগবত। ওই দুই সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহান ব্যক্তির কলকাতায় শুভাগমন তো একেবারে নীরবে রবে, তা তো হবে না। সেটা তাঁদের নীতিও নয়। তাঁরা যখন যেখানেই যান-না কেন, যেখানেই অবস্থান করুন-না কেন, তার দ্বারা দেশ-জাতি- সমাজের কল্যাণ যেন অবশ্যই হয়, অবশ্যই মঙ্গল হয় হিন্দু সমাজের— সেই চিন্তা, সেই চেষ্টা অন্তরে নিরন্তর থাকতে হবে— এটিই তাঁদের গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষা ও সেই ব্রত গ্রহণ। সুতরাং এবারও তার অন্যথা তো হবে না।

—তাই দেখালাম, সেদিন নারায়ণ-দা অর্থাৎ নারায়ণ পাল (যিনি আজ আর স্থূলদেহে নেই) এসেছেন বালিগঞ্জ-স্থিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণব কার্যালয়ে। এসে এই সেবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অবশ্য স্নেহশীল নারায়ণ-দা সঙ্ঘে এলেই অবশ্যই দেখা করে যেতেন। কেমন আছি, না আছি খোঁজ নিতেন। তিনি বলেন— ...তারিখে কেশবভবনে আলোচনা সভা রয়েছে। সুদর্শনজী ও মোহন ভাগবতজী থাকবেন। আপনি অবশ্যই আসবেন। বরাবরই তাঁর কথায় সায় দেওয়াটা অভ্যাসে পরিণত হওয়ায়, না-করার প্রশ্নই ছিল না।

নির্দিষ্ট দিনে সঙ্গে স্বামী সেবাব্রতানন্দজীকে (যিনি আজ স্থূলদেহে নেই) নিয়ে উপস্থিত হলাম কেশবভবনে। দেখলাম, একতলার নাতিবৃহৎ সভাগৃহে সমাগত অতিথিতে পরিপূর্ণ। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসলাম। দেখলাম, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরীজী মহারাজ এসেছেন। এসেছেন দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ থেকে শ্রীমৎ মুরালভাই। মহানাম অঙ্গন থেকে এসেছেন শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী। তাছাড়াও আরও অনেক আশ্রম, মঠ থেকেও বহুজনই এসেছেন। এসেছেন শিখ-সমাজের যাঁরা নিজেদেরকে হিন্দু বলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন তাঁরাও। এছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরাও যে সেখানে থাকবেন তা তো বলাই বাহুল্য।

যথাসময়ে পূজ্য দুই মহাজন শ্রীসুদর্শনজী ও শ্রীমোহনজী সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। উভয়েই অসাধারণ কিন্তু পোশাক পরিচ্ছদ অতিসাধারণ। এসেই তাঁরা সবিনয়ে বা ভক্তিচিত্তে সমাগত সাধু-মহাত্মাদের গলায় মালা পরিয়ে সকলকে বরণ করলেন। কেউ কেউ তাঁদেরও মালা দিয়ে বরণ করলেন। বরণপর্ব শেষে সভা শুরু হলো। যথাসময়ে এই সেবককে সভা-সঞ্চালক শ্রীবন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ আহ্বান জানালেন কিছু বলার জন্য। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ইষ্ট ও শ্রীগুরু স্মরণের পর তাঁদের কৃপায় যে কথাগুলি সকলের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছিল তন্মধ্যে এ-স্থলে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

'পরিবর্তন (রাজনৈতিক) পরিবর্তন, পরিবর্তন। চারিদিকে এখন পরিবর্তনের কথাই শোনা যাচ্ছে। পরিবর্তনের লক্ষণ অতি স্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, কার পরিবর্তে কাকে আনা হবে? জঙ্গলের বাঘকে তাড়িয়ে খাল কেটে কুমিরকে আনা হবে না তো?

সে যাই হয় হোক, আমাদের কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না। আমরা যাঁরা বিভিন্ন সংগঠনে থেকে হিন্দু-সংগঠনের জন্য কাজ করে চলেছি— সেই আমাদের সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। শক্তিশালী হতে হবে— তাহলেই হিন্দুবিরোধী শক্তির হিন্দুর কোনোরকম ক্ষতি করার সাহস হবে না। সুতরাং আমরা

ফঃ ৬

যেন সে কাজটিই সকলে মনোযোগ দিয়ে করি।'

বক্তব্য শেষে পুনরায় স্বস্থানে এসে বসলাম। অন্যদিকে সভা- সঞ্চালক বন্ধুগৌরব মহারাজ বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বলেন— 'মহারাজজী তাঁর বক্তব্যে পরিবর্তন মানে বনের বাঘকে তাড়িয়ে খাল কেটে কুমির আনার যে কথা বলেছেন, তার সঙ্গে আমরা একমত নই। আমরা মনে করি— পরিবর্তনের ফলে যেই আসুক সেজন্য আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না, ভালোই হবে বলে মনে করি।'

সভার শেষলগ্নে সভার মুখ্য আকর্ষণ শ্রদ্ধেয় শ্রীমোহনজী তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে সকলের নিকট রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য জানিয়ে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালে সকলেই আনন্দিত হন। সভাশেষে ভারত-জননীর দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের নিকট বিদায় নিয়ে যে-যার স্থানে ফিরে আসি।

পথের ঘটনা, কিছুদিন পরেই নির্বাচন হয়। রাজ্যে অনিবার্য পরিবর্তনও হয়। রাজ্যবাসীর পছন্দের দল ও ব্যক্তিই রাজ্যপাটে অভিষিক্ত হন। এক-দুটি করে দিন যেতে যেতে বছর যতই পূর্ণ হয়, ততই নবাগত শাসক ও তাঁর দলের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হতে শুরু করে। তারপর এ-যাবৎ যা যা ঘটেছে তা দুর্বল স্মৃতির মানুষ হলেও প্রায় সকলেই অবহিত।

তাই সেসব কথা এখানে উল্লেখ করে প্রবন্ধকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। তবে শেষ পর্যায়ের যে সকল ঘটনার মধ্যে দিয়ে শাসকের ভয়ানক স্বরূপকে হিন্দুরা ভীষণভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তার ফলে হিন্দুরা যে রাজ্যে কতখানি অসহায় তা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করতে পেরেছে বলে মনে হয়। যেমন একজন বিধায়কের হুঁশিয়ারি— হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা। কোনো মন্ত্রী বলছেন— যারা হিন্দু হয়ে জন্মেছে, তাদের দুর্ভাগ্য, তাদের ইসলামে দাওয়াত দিতে হবে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন— একটি কমিউনিটি এক সেকেন্ডে সব হিন্দুকে শেষ করে দেবে প্রভৃতি। পরিবর্তনের ফলে রাজ্যে শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত শক্তির রক্তচক্ষু ও প্রসারিত নখ-দন্তের প্রভাবে ভীত, বিচলিত হননি এমন হিন্দু ক'জন ছিলেন? তাই মনে হয়, সেদিন কেশবভবনের সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সেদিন প্রকাশিত সতর্কবার্তার সত্যতা কত গভীরে, তা এখন অনুভব করছেন।

অথচ সেদিন সেই সভায় থাকা প্রায় সকলেরই হয়তো মনে হয়েছিল— এই সন্ন্যাসী এসব কী বক্তব্য রাখছে? একি প্রকৃতিস্থ না অপ্রকৃতিস্থ। কেন-না এখনো যেখানে নির্বাচনই হলো না, নির্বাচিত দল শাসন দণ্ডই গ্রহণ করল না, কোনো কিছুই করল না, তখন তাদের সম্পর্কে ওই ধরনের বার্তা কতটুকু যুক্তিসম্মত!

যাইহোক, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যেই কাল পূর্ণ হয়েছে, তখনই তার চিরবিদায় হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-সহ সকল হিন্দুত্বপ্রেমী প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এবং শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজীর কঠোর পরিশ্রমে খাল কেটে ডেকে আনা কুমির আজ আবার কোনো জলাশয়ে চলে গেছে। স্বস্তি পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

সুদর্শনজীর জীবনদর্শন যেন তপোবনের শান্ত সুন্দর এবং আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী মননের এক অনন্য সংমিশ্রণ। তিনি কেবল একজন প্রচারক ছিলেন না বরং ছিলেন এক শাশ্বত ভারতীয় চেতনার স্থপতি।

রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর ভূমিকা

সরোজ চক্রবর্তী

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ভারতের অন্যতম একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই সংগঠনের ইতিহাসে কে এস সুদর্শন (কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শন) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাম। ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পঞ্চম সরসঙ্ঘচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন সময় ছিল ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।

সুদর্শনজীর কার্যকাল ছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের সমসাময়িক। বিশেষ করে অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং কাশ্মীর ইস্যুতে সরকারের নরম মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করতে তিনি পিছপা হননি। তাঁর এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, তিনি সংগঠনের আদর্শগত বিশুদ্ধতাকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। তিনি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের অনুপ্রবেশ সমস্যা এবং অভ্যন্তরীণ মাওবাদী সন্ত্রাসের মোকাবিলায়। তাঁর মতে, 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাই (Cultural Nationalism) ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার একমাত্র কবচ।

সুদর্শনজীর চিন্তাধারায় স্বদেশি ও বিজ্ঞানমনস্কতা— এই দুটি বিষয় বিশেষভাবে প্রাধান্য পেত। তিনি মনে করতেন ভারতের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ পশ্চিমি পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ নয়, বরং বিকেন্দ্রীভূত 'স্বদেশি মডেল। তিনি বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্যের বিরুদ্ধে এবং গ্রামীণ অর্থনীতির শক্তিশালীকরণের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তিনি টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিঙের স্নাতক ছিলেন। তাই তাঁর ভাবনার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি বেদের জ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক। তাই তিনি ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নয়নে 'স্বদেশি অর্থনীতি' ও 'আধুনিক বিজ্ঞানে'র মধ্যে আধ্যাত্মিক মেলবন্ধন করতে চেয়েছিলেন।

সুদর্শনজীর কার্যকালে সঙ্ঘের সামাজিক কার্যাবলীর পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং অবহেলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে সংগঠনের ভিত মজবুত করার উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তিনি সংগঠনকে কোনো একটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে জাতীয় অর্থনীতির এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক করে তোলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতা এবং স্বদেশি ভাবধারা আজও স্বয়ংসেবকদের কাছে প্রেরণার উৎস।

সুদর্শনজী সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক হওয়ার অনেক আগেই 'স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁর অর্থনৈতিক দর্শন ছিল মূলত 'ভারতীয় মডেল'-এর উপর ভিত্তি করে। তিনি গান্ধীজীর গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতির ধারণাকে সমর্থন করতেন। তাঁর মতে, ভারতের উন্নয়ন হওয়া উচিত বিকেন্দ্রীভূত উপায়ে, যেখানে গ্রামগুলো স্বনির্ভর হবে। তিনি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর নির্দেশিত অর্থনৈতিক নীতির কড়া সমালোচক ছিলেন। তাঁর মতে, এই নীতিগুলো পুঁজি নিবিড় কিন্তু শ্রম নিবিড় নয়— যা ভারতের মতো জনবহুল দেশে বেকারত্ব সৃষ্টি করে। যারা বামপন্থীদের গুণগান করে বলেন যে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে একমাত্র বামপন্থীরাই আন্দোলন করেন, তাদের কাছে সুদর্শনজীর এই বার্তাটি পৌঁছানো দরকার। বামপন্থী নেতা-নেত্রীদের

আগেই আত্মনির্ভর ভারতের উন্নয়নের স্বার্থে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবল নিজস্ব সম্পদ ও প্রযুক্তির মাধ্যমেই ভারত প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। বর্তমান ভারত সরকারের আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের আদর্শ ও ভিত্তি তাঁর সময়ই প্রোথিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তিনি প্লাস্টিক বর্জন থেকে জ্বালানি তেল উৎপাদন-সহ দেশীয় উদ্ভাবনী প্রযুক্তির গবেষণায় উৎসাহ দিতেন। সুদর্শনজীর উপস্থিতিতে ২০০২ সালের ২৪ ডিসেম্বর দিল্লিতে 'মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ' আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এটি ছিল সঙ্ঘের ইতিহাসে একটি জাতীয় সংহতির বড়ো পদক্ষেপ। এই সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ বৃদ্ধি করে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন এবং তাদের সংস্কৃতিও অভিন্ন। তিনি নিজে ইসলাম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি প্রায়ই মুসলমান মৌলবি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। তিনি গোহত্যা নিষিদ্ধ করার পক্ষে জনমত গঠন করতে, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের দাবিতে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুদর্শনজীর এই উদ্যোগগুলো প্রমাণ করে যে, তিনি ভারতের আর্থ-সামাজিক সংকটের স্থায়ী সমাধান খুঁজতেন।

সুদর্শনজী কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং নারীশক্তির ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিবাহের এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে আড়ম্বরের ঘোর বিরোধী ছিলেন। দরিদ্র মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপনের জন্য তিনি স্বয়ংসেবকদের অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি মনে করতেন প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ হিন্দু-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি জল অপচয়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

তিনি মেকলের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বদলে ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার চেয়েছিলেন। পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং জনবিন্যাস পরিবর্তনের বিপদের কথা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। সুদর্শনজীর এই কাজগুলো সঙ্ঘকে একটি আধুনিক ও মূলাশ্রয়ী সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

সুদর্শনজীর সমন্বয়ী চেতনা হলো প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের এক অনন্য সেতুবন্ধন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারত তখনই বিশ্বগুরু হতে পারবে যখন সে নিজের আধ্যাত্মিক শিকড়কে না হারিয়ে আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে। তিনি একহাতে কম্পিউটার এবং অন্যহাতে গ্রামীণ কুটির শিল্পের বিকাশের স্বপ্ন দেখতেন। তিনি বলতেন যে, 'হাইটেক সিটি' যেমন দরকার তেমনি দরকার 'গ্রামস্বরাজ'। আধুনিক প্রযুক্তির সুফল যেন ভারতের ঐতিহ্যবাহী পেশা যেমন— হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প প্রভৃতি শিল্পের কারিগরদের জীবনমান উন্নত করতে ব্যবহার করা হয়, সেটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

সুদর্শনজীর ভাবনার একটি বড়ো অংশ ছিল জাতিভেদহীন এক সুসংহত সমাজ নির্মাণ। তিনি মনে করতেন ভারতের উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি সমাজের প্রতি স্তর এবং প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক সমন্বয় না থাকে। বিভাজন নয় বরং বসুধৈব কুটুম্বকম্— এই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধকে তিনি ভারতের অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস মনে করতেন। তিনি 'গ্লোবাল' (Global) এবং 'লোকাল' (Local)-এর মধ্যে 'গ্লোকালাইজেশন' (Glocalisation) করতে চেয়েছিলেন। বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভূমিকা তখনই জোরালো হবে, যখন ভারতের অর্থনীতি নিজস্ব শক্তিতে অর্থাৎ স্বদেশীয়ানায় বলীয়ান হবে। বর্তমানে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' এবং 'সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ' যেন তাঁর সমন্বয়ী স্বপ্নেরই এক বাস্তব রূপায়ণ। তিনি 'ইকোলজি' এবং 'ইকোনমি'র মধ্যে সমন্বয় চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, গোবংশ রক্ষা বা জৈব চাষ কেবল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং এটি ভারতের মৃত্তিকা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক মডেল। সম্প্রতি 'ভোকাল ফর লোকাল' নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সুদর্শনজী তার বীজ বপন করেছেন দশকের পর দশক ধরে। তিনি বিশ্বায়নের বা গ্লোবালাইজেশনের আগ্রাসী পদক্ষেপ থেকে দেশীয় কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল, 'পণ্য হোক ভারতীয়, পুঁজি হোক ভারতীয় এবং পরিশ্রমও হোক ভারতীয়'— এটি আজ ভারতের এমএসএমই (MSME) সেক্টরের মূল ভিত্তি। তিনি চেয়েছিলেন, ভারত যেন উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্ববাজারে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আজকের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ক্যাম্পেইন মূলত তাঁর সেই চিন্তাধারার সুদূরপ্রসারী এক আধুনিক ডিজিটাল সংস্করণ। ভারতের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যে আগামীর বিশ্ব নেতৃত্ব তৈরি হবে, তা তিনি বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

সুদর্শনজীর 'স্বদেশী চার্চ' বা 'জাতীয় গির্জা'র ধারণাটি ছিল ভারতীয় খ্রিস্টান সমাজকে বিদেশি নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব। ২০০১ সালে একটি অনুষ্ঠানে তিনি প্রথম ভারতীয় খ্রিস্ট সম্প্রদায়কে এই আহ্বান জানান। যা পরবর্তীতে ভারতের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। তিনি চেয়েছিলেন, ভারতীয় খ্রিস্টানরা ভ্যাটিকান বা অন্য কোনও রিলিজিয়াস কেন্দ্রের অধীনে না থেকে একটি স্বাধীন ও জাতীয় গির্জা বা ফেডারেশন গঠন করুক। তাঁর মতে, এটি হবে ভারতকে সব ধরনের বিদেশি নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ।

সুদর্শনজী মনে করতেন বিদেশি মিশনারিদের কার্যক্রম ভারতের ঐক্য ও সংহতির জন্য হুমকি স্বরূপ। তিনি কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত ভারতীয় চার্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। যা কেবল দেশের আভ্যন্তরীণ নিয়ম ও সংস্কৃতি অনুযায়ী চলবে। তিনি কেরলের 'অর্থোডক্স সিরিয়ান' এবং 'মারথোমা চার্চ'কে একটি আদর্শ 'স্বদেশি চার্চ' হিসেবে উল্লেখ করতেন। কারণ তাদের কর্মকাণ্ড ভ্যাটিকানের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তিনি ভারতীয় খ্রিস্টানদের মনে করিয়ে দিতেন যে, তাঁদের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন এবং তাঁদের শিরায় শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তাই তাঁদের উচিত গির্জার আচার-আচরণে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটানো। তাঁর এই প্রস্তাবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত মিশনারিদের মাধ্যমে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া বন্ধ করা। সুদর্শনজীর এই দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্ঘের 'এক জাতি এক সংস্কৃতি' আদর্শের পরিপূরক । তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মীয় পরিচয় যাই হোক না কেন, আনুগত্য কেবল ভারতের প্রতি থাকা উচিত।

সুদর্শনজীর জীবনদর্শন যেন তপোবনের শান্ত সুন্দর এবং আধুনিক বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী মননের এক অনন্য সংমিশ্রণ। তিনি কেবল একজন প্রচারক ছিলেন না বরং ছিলেন এক শাশ্বত ভারতীয় চেতনার স্থপতি। ভারতের উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণের তাঁর স্বদেশি ভাবনা আজ আর কেবল কোনও তাত্ত্বিক বিতর্ক নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইকোনমিক গেম চেঞ্জার, যাকে বলা যায় সাস্টেনেবল ফিউচারিস্টিক মডেল বা'আদর্শগত সংস্কারের যুগ।

২০১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রতিদিনের মতো সকালে পূজায় বসে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় এই রাষ্ট্রসাধক ইহলোক ত্যাগ করেন। □

এবারের নির্বাচনে বিজেপির জয় হিন্দুত্বের জয়

সাধারণ মানুষ ভেবেছে এই সরকারকে আগামীদিনে ক্ষমতায় রাখলে দেশের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার ক্ষেত্রে বড়ো বিপদ তৈরি হবে। তাই অন্যান্য অসংখ্য ইস্যু থাকলেও ২০২৬-এ বাঙ্গালির হোমল্যান্ডে হিন্দুত্বের ইস্যু বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে।

তারক সাহা

১৯৯৮ সালে ভারতের রাজনীতিতে দুটো দলের জন্ম হয়। দুটো দলেরই ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত নাম— টিএমসি। দু'টো দলই সীতারাম কেশরীর কংগ্রেস ভেঙে জন্ম। এর মধ্যে একটি তামিলনাড়ুর 'তামিল মানিলা কংগ্রেস' যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জিকে মুপানার, অপরটি পশ্চিমবঙ্গের 'তৃণমূল কংগ্রেস' যার প্রতিষ্ঠাতা মমতা ব্যানার্জি। জিকে মুপানারের দল উঠে যায় তাঁর মৃত্যুর পর। আর তৃণমূল কংগ্রেস টিকে যায় বিক্রম ও বেতালের গল্পের মতো। বিক্রমরূপী বিজেপিকে পেয়ে যায় বেতালের ভূমিকায় অবতীর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির ঘাড়ে চড়ে তৃণমূলনেত্রী তার দলের প্রসার ঘটান। ১৯৯৯ সালে সাংসদ হয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর বদান্যতায় রেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হন তিনি। এরপর ২০০৯ সালে ইউপিএ-২ জোট সরকার হলে ডিগবাজি খেয়ে মনমোহন সিংহের সরকারেরও রেলমন্ত্রী হন। এরপর রাজ্যের ক্ষমতা দখলকে পাখির চোখ করে রাজ্যের জন্য বিভিন্ন রেলপ্রকল্প ঘোষণা করে বিশেষত লোকাল ট্রেনে মহিলাদের জন্য বগি দিয়ে মহিলাদের মন জয় করেন। এরপর এল ২০১১ সাল। বামফ্রন্টের ভয়ংকর অত্যাচার, দুর্নীতি ও বাম নেতাদের ঔদ্ধত্য বামফ্রন্টকে জনগণের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং এই সুযোগে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে নেমে সাফল্য আসে। তার আগে ২০০৮ সালে সিপিএমের প্রকাশ কারাতের একটা ভুল সিদ্ধান্ত ২০০৯ সালে তৃণমূলের জয়ের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ২০০৪ থেকে বামফ্রন্ট সহযোগী হিসেবে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ইউপিএ-১ জোট সরকারকে বাইরে থেকে ইস্যুভিত্তিক সমর্থন করত। আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে কারাতের দল ইউপিএ জোট থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার পর রাজ্যস্তরের সম্পর্কেও চিড় ধরে এবং বাম-কংগ্রেস জোট ছিন্ন হয়। সুচতুর তৃণমূলনেত্রী এই সুযোগে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে রাজ্যে ক্ষমতায় আসেন এবং এরপর বাকিটা ইতিহাস।

জিকে মুপানারের টিএমসি'র ভাগ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মতো অতটা সুপ্রসন্ন ছিল না। তৃণমূল যেমন জন্মের পরই বেতালের মতো বিজেপিকে ব্যবহার করেছে, সেই কায়দায় মই বেয়ে ওপরে ওঠার তেমন সুযোগ হয়নি তামিল মানিলা কংগ্রেসের।

এরপর ২০২৬ সাল। ভাগ্যের কী পরিহাস! যে বিজেপির কাঁধে চড়ে একদা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পায় তৃণমূল, সেই বিজেপির সঙ্গে লড়াইয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তার বধ হলো বিধানসভা নির্বাচনে। এর পিছনে নানাবিধ কারণ থাকলেও অন্যতম কারণ হলো হিন্দুদের বিরোধিতা এবং মুসলমান তোষণ। এই সম্প্রদায়কে ভোটব্যাংক বানাতে ক্ষমতায় এসেই ইমাম, মোয়াজ্জেমদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা এবং চারিদিকে নিন্দার ঝড় ওঠায় পরবর্তীতে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ পুরোহিতদেরও ভাতা চালু করে সরকার। ইমাম-মোয়াজ্জেম মাসিক ভাতার চালু করার জন্য জনমানসে ক্ষোভ তৈরি হয়।

২০২৬- এর নির্বাচনে এক ঐতিহাসিক সাফল্য পেল বিজেপি। এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে, যেমন— রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, অপশাসন, চাকরি চুরির দায়ে দলের রাজ্য সরকারের দু'নম্বর মন্ত্রীর জেলযাত্রা, তাঁর বান্ধবীর বাড়ি থেকে রাশি-রাশি টাকা ও গয়না উদ্ধার, রেশনের খাদ্যসামগ্রী চুরি, গোরু, পাথর, বালি, কয়লা পাচার-সহ সরকারের সব দপ্তরের দুর্নীতি ইত্যাদি। এর সঙ্গে তৃণমূলের এই অভাবনীয় পরাজয়ের অন্যতম মূল কারণ হলো— হিন্দু ভোটের একত্রীকরণ। তৃণমূলের কোনো নেতাই ভাবতে পারেনি যে, হিন্দু ভোটাররা ব্যাপক হারে, সংগঠিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যাবে। এতদিন অবিজেপি কোনো রাজনৈতিক দল হিন্দুদের সংগঠিত হিসেবে ভাবেনি। মুসলমান ভোট মসজিদ থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় বলেই তৃণমূলনেত্রীকে বারবার ইমামদের তৈলমর্দনে যেতে হয় মসজিদে বা রেড রোডে হিজাব পড়ে। এর আগে অন্য কোনো ভোটে এরাজ্যের হিন্দুরা এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কোনো হিন্দুবিরোধী রাজনৈতিক দলের বিপক্ষে যায়নি। হিন্দুরা এবার সঙ্ঘবদ্ধভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিল কেন তার কারণ হলো—

(১) মুর্শিদাবাদে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের হিন্দুবিরোধী উক্তি পশ্চিমবঙ্গের সাধুসন্তদের ক্ষেপিয়ে তোলে। সেই বিষাক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বেলডাঙ্গার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মঠাধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের অসন্তোষ

প্রকাশের পর তাঁকে হুমকি দেন তৃণমূলনেত্রী। হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি রাজ্য প্রশাসন, এমনকী নিন্দাপ্রস্তাবও নেওয়া হয়নি তার বিরুদ্ধে। অথচ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করানো হয় এক মহিলাকে দিয়ে। বারো বছর আগের একটি অভিযোগে দায়ের হয় সেই মিথ্যা মামলা। অবশ্য আদালতে তা খারিজ হয়ে যায়। এই ঘটনায় রাজ্যের সব সাধুসন্ত চরম বিরাগভাজন হন তৃণমূল কংগ্রেস দলটির প্রতি। ক্ষমতায় মোহে অন্ধ তৃণমূল কংগ্রেস ভুলে যায় যে, সাধুসন্তদের অপমান— সনাতন ধর্মের ওপর আঘাতের সমান।

(২) সামশেরগঞ্জের হিন্দু পিতা-পুত্রকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা হিন্দু ভোটকে নীরবে সংগঠিত করেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। একদা সিপিএম সমর্থক হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সিপিএম তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তাঁদের পরিবার জানিয়েছে যে, তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীই একমাত্র তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এই হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই জেহাদি সন্ত্রাসে নিজভূমে পরবাসী হতে হয় মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু হিন্দুদের। তাঁদের অনেককেই নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে মালদহে শরণার্থী হতে হয়। স্বাধীনতার পরে এরাজ্যে এরকম দ্বিতীয় ঘটনা ঘটেনি। এক্ষেত্রেও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কোনো পদক্ষেপ করেনি রাজ্য প্রশাসন।

(৩) তৃণমূলের অপশাসনের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনার উদাহরণ হলো ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট তারিখে আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, যা দেশের সীমানা পেরিয়ে সারা বিশ্বের জনমানসকে ক্ষুব্ধ করেছে। এই ঘটনায় তদন্ত করে হত্যাকারী কে বা কারা, এই জঘন্য ঘটনার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত কে বা কারা তার অনুসন্ধান না করে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশ সবসময় চেষ্টা করেছে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার। তথ্যপ্রমাণ লোপাটের দায়ে অভিযুক্ত যারা, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। উল্টে মৃতার বাবাকে দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বিষয়টি চেপে যাওয়ার অপচেষ্টা চালায় উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররা। কাকে বা কাদের বাঁচাতে তারা এই প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা উন্মোচনে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকার পুনরায় আরজি কর তদন্তের ফাইল খুলেছে এবং ওই সময়ে ডাঃ অভয়ার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনজন আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে রাজ্যে শিক্ষা নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি সামনে আসে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় টাকার পাহাড়। দুর্নীতি ধরা পড়ে যাওয়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে চাকরি পাওয়া ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট।

(৪) সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ঘটনা রাজ্যের জনমানসে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে। এখানে প্রবল নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন হিন্দু মহিলারা। অভিযোগের তির সেই জেহাদি, তৃণমূলিদের বিরুদ্ধে। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাজাহান ও তার শাগরেদদের অত্যাচার আজ সর্বজনবিদিত। হিন্দু মহিলারা ছিলেন এদের লক্ষ্য। এই সনাতনী হিন্দুরা জোট বেঁধে সমূলে উৎপাটন করেছে তৃণমূলকে। এই হিন্দু নারীদের প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্র আজ হিঙ্গলগঞ্জের বিধায়িকা। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে এরাজ্যে মা কালীর প্রতিমা ভেঙে, সেই প্রতিমাকে প্রিজন ভ্যানে তোলার ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে।

আজ রাজ্যে ক্ষমতায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার। ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় এসেই সাড়ে চারশো কিলোমিটারের ওপর অরক্ষিত বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর লক্ষ্যে বিএসএফকে জমি বরাদ্দের নির্দেশ দিয়েছে। গত ১৫ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও জমি দেয়নি তৃণমূল সরকার। বামফ্রন্ট ও তৃণমূল আমলে জেহাদিদের লক্ষ্য ছিল একটাই। অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সীমান্তবর্তী জেলা-সহ অনেক শহর ও গ্রামের জনবিন্যাসের তারা পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দুই শাসকের উদ্দেশ্য ছিল— অবৈধ ভোটার বাড়ানো এবং সেই ভোটব্যাংকের দ্বারা গদি সুরক্ষিত রাখা। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনবিন্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনে শঙ্কিত হয় রাজ্যের হিন্দু সমাজ। যে জমি সমস্যা দেখিয়ে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য পূর্ববর্তী সরকার জমি দেয়নি, মাত্র কয়েকদিনের পার্থক্যে নতুন সরকার কীভাবে সেই জমির ব্যবস্থা করতে পারে? প্রশাসনিক সদিচ্ছাটাই যে রাজ্য সরকার পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী।

হিন্দুদের আরও একটি আশঙ্কার কারণ ছিল। তৃণমূল সরকার ছিল দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে বিপজ্জনক। তৃণমূলনেত্রী পরিচালিত সরকার ভারতীয় সংবিধান মেনে চলত না। কেন্দ্রীয় প্রকল্প যেমন— আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যবিমা দেশের সব রাজ্যে বলবৎ হলেও পশ্চিমবঙ্গ ছিল ব্যতিক্রম। 'অশোক স্তম্ভ' সরকারি প্রতীক হলেও তা ব্যবহার না করে 'বিশ্ববাংলা লোগো' ব্যবহৃত হয় গত পনেরো বছর। সারা দেশে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া হচ্ছে, সেখানে এরাজ্যের জন্য ছিল পৃথক রাজ্যসঙ্গীত। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' এখানে নাম বদলে হয়ে যায় 'বাংলার বাড়ি'। প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক স্লোগান 'জয় বাংলা' হয়ে ওঠে এরাজ্যের ব্যবহৃত স্লোগান। বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা 'খেলা হবে' স্লোগানও বহুল ব্যবহৃত শব্দবন্ধ বিগত নির্বাচনগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারাভিযানে। এইসবের কারণে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হিন্দু জনমত সংগঠিত হয় প্রবলভাবে। যার ফলে ধরাশায়ী হয় তৃণমূল।

সাধারণ মানুষ ভেবেছে এই সরকারকে আগামীদিনে ক্ষমতায় রাখলে দেশের সার্বভৌমত্বের ও অখণ্ডতার ক্ষেত্রে বড়ো বিপদ তৈরি হবে। তাই অন্যান্য অসংখ্য ইস্যু থাকলেও ২০২৬-এ বাঙ্গালির হোমল্যান্ডে হিন্দুত্বের ইস্যু বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্ম রক্ষার লক্ষ্যে এবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে রাজ্যবাসী। □

‘কালো রাতি গেল ঘুচে...’?

অমিত দাশ

২০০২ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন প্রকাশিত হয়েছিল এই লেখকের প্রথম বই ‘হিন্দু-মুসলমান সমস্যা— কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ’। যারপরনাই সমালোচনা সত্ত্বেও ২০০৬-এ প্রকাশিত ‘দুষ্টুবুদ্ধি বুদ্ধিজীবী— হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথ।’ গ্রন্থটির জন্য প্রকাশক পরলোকগত অরুণ ঘোষ (বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র) গোয়েন্দা বিভাগের দ্বারা লাঞ্ছিত হন। একই পরিণামের সম্মুখীন এই প্রতিবেদককেও হতে হয়েছিল— সে কথা বলা বাহুল্য।

বইটিতে তুলে ধরা হয়েছিল কীভাবে গুজরাট দাঙ্গায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিযুক্ত করে মিথ্যার বেসাতি খুলে বসেছিলেন পণ্ডিত ব্যবসায়ীরা (রবীন্দ্রনাথ এই অভিধাটিই পছন্দ করতেন)।

বিভিন্ন পত্রিকায় একই ব্যক্তি নিজেদের বর্ণনা পরিবর্তন করে রচনা প্রকাশের সময় যাবতীয় লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী, অরুন্ধতী রায়, অশোক দাশগুপ্ত, দিলীপ রায় থেকে আরম্ভ করে সাধারণ যদু-মধু সাংবাদিককুল। নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে দেওয়া বিবৃতিসমূহ মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছিল উল্লিখিত গ্রন্থে। দুঃখজনকভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে যুক্ত জনৈকা মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন এদের দলে।

২০১৪-তে ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেশের মানুষ যোগ্য জবাব দিয়েছেন। ২০২৬-এ জবাব দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ।

‘স্বস্তিকা’তে লেখালেখির কারণে বাড়ির গেটের সামনে থাকা চিঠির বাক্স থেকে পত্রিকা চুরি করে শাসিয়ে ছিল তৃণমূল গুন্ডারাও। লেখা যাবে না, পত্রিকা রাখা চলবে না— এমন ফতোয়া জারি হলে বাধ্য হয়ে পার্সেলের মাধ্যমে মাসের চার/পাঁচটি সংখ্যা একসঙ্গে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। স্বভাবতই আমরা ‘ঘর পোড়া গোরু’। ভবিষ্যৎ নিয়ে (আমাদের নয়, পরবর্তী প্রজন্মের) চিন্তা কিন্তু দূর হয়নি।

কারণ সমূহের মধ্যে প্রথমেই বলা প্রয়োজন ২০২৬-পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট পেয়েছে মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৬ শতাংশের কাছাকাছি। তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বামপন্থী, আইএসএফ এবং হুমায়ুনের দল মিলে বাকি ৫৪ শতাংশ।

আগামী লোকসভার নির্বাচনের আগে এরা জোটবদ্ধ হয়ে যাবে। শতরূপ ঘোষ যতই গর্জন করুন না কেন মনে রাখতে হবে ‘ফিশফ্রাই’ সিপিএম-ই খেয়েছে— আরও কিছু খাবার ইচ্ছে তাদের জাগবে না, তেমন ভাবা যথার্থ হবে না।

তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে গেলে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসে মিশেও যেতে পারেন— প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব তাঁর হাতে থাকবে এই শর্তে। বাকি দলগুলির অবস্থাও তো ‘জেহাদি’ হবার প্রতিযোগিতায়— ‘কার আগে প্রাণ কে করিবে দান’।

জোটবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকটি লোকসভা আসনেও একজন প্রার্থীর সমর্থনে এগিয়ে আসবার সম্ভাবনা প্রবল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-ও হতে পারে— কার্যোদ্ধার হবে অথচ জাত খোয়ানোর ভয় থাকবে না।

সুতরাং, বিজেপিকে এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে— আরও অন্তত ৬/৭ শতাংশ ভোট বাড়ানোর চেষ্টা করতেই হবে। জয়ের মোহে আচ্ছন্ন হবার কারণ নেই।

বিভিন্ন অঞ্চলে ভাবমূর্তি ভালো, এমন সাধারণ মানুষকে যুক্ত করতেই হবে। নানা ধরনের পরিকল্পনা নেওয়ার প্রয়োজন ঘটবে— রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখের ভাবনা তুলে ধরতে হবে মানুষের সামনে— যা চেপে রাখবার চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত ব্যবসায়ীরা দীর্ঘকাল।

চোর, গুন্ডা, খুনি, দুর্নীতিপরায়ণদের কিছুতেই দলে নেওয়া হবে না— যা অবশ্য বর্তমান বিজেপি সভাপতি বহুবার বলেছেন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগৎ দখল করে থাকা পণ্ডিত ব্যবসায়ীরা বিদায় নিতে বাধ্য হলে সেই স্থান দখল করবার জন্য সমুদ্যত থাকবে কমিউনিস্টরা, তাদের অতি প্রিয় বাণী— ‘সরকার যারই হোক না কেন, সিস্টেম আমাদের’।

সর্বভারতীয় স্তরে বিক্রম সম্পত, সঞ্জীব সান্যাল, জে. সাই দীপক, আনন্দ রঙ্গনাথন, অশ্বিনী উপাধ্যায়, পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠ প্রমুখ নির্দিষ্টজন জোরের সঙ্গে দেশাত্মবোধক বক্তব্য তুলে ধরেন। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রায় উন্মুক্ত ক্ষেত্র। অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, জিষ্ণু বসু এবং আরও কিছু মানুষ আছেন বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার গভীরতা আরও বহু চিন্তাশীল মানুষের অপেক্ষায় রয়েছে।

অবশ্য ‘সম্প্রতি উৎসাহী’ হয়ে ওঠা মানুষের বন্যা প্রতিরোধ করাও সহজ নয়— অতীত নিয়ে নাড়াচাড়া বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। গোড়াতেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া গেলে ‘কালো রাতি’ ঘুচেও ঘুচবে না।

বামফ্রন্ট সরকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ‘সহজপাঠ’ তুলে দিয়েছিল। ‘কালো রাতি’ দূর হয়ে আলোর প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথ ‘সহজপাঠ’-এ করেছিলেন— সে আলোকে চিরন্তন অন্ধকার করে তুলতে যখন ভারতের প্রত্যেকটি পারিবারিক দল যারপরনাই তৎপর। এই একদফা (অপ) কর্মসূচি-তে তাদের বিন্দুমাত্র মতপার্থক্য নেই। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৭৮)

প্রবাসের মজা ও 'ইনফ্লুয়েঞ্জা সপ্তাহ'

বিভিন্ন প্রদেশে সঙ্ঘের কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তারজীর কাজের মাত্রা এত বৃদ্ধি পেল যে চব্বিশ ঘণ্টাও কম মনে হচ্ছিল। নিরন্তর ভ্রমণসূত্রে সেবার (১৯৩৭) পুনা যাচ্ছিলেন। সাধারণভাবে প্রবাসে বের হলে ডাক্তারজী পথের বিভিন্ন স্থানের স্বয়ংসেবকদের জানিয়ে রাখতেন, তারা স্টেশনে এলে দেখা সাক্ষাৎ হতো। নাগপুর থেকে পুনা শিক্ষণ বর্গে যাওয়ার সময় পথে সিন্দী, ওয়ার্ধা, অকোলা ইত্যাদি স্থানসমূহে আগেই বার্তা পাঠানো হয়েছিল। সেবার ডাক্তারজীর সঙ্গে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ পুরাণিক। সিন্দী স্টেশনে মজার ব্যাপার হলো। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছতেই মহকুমা সঙ্ঘচালক নানাসাহেব টালাটুলে ডাক্তারজীকে বিভিন্ন কামরায় খুঁজতে থাকেন। ডাক্তারজী তখন শ্রীকৃষ্ণজী-সহ প্লাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়ে। খুঁজে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় ট্রেন ছাড়ার বাঁশী বাজলে ডাক্তারজীরা ট্রেনে উঠলে ট্রেন ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে, আর কার্যকর্তাদের সামনে দিয়ে যেতেই ডাক্তারজী উচ্চৈঃস্বরে নানাজীকে নমস্কার জানান। সবাই দেখলেন ডাক্তারজীকে। ডাক্তারজীকে খুঁজে না পাওয়ার দুঃখ এবার হাসিতে পরিণত হলো।

ডাক্তারজী খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি আর মাথায় সাদা টুপি পড়েছিলেন, পুরাণিকজীও তাই। ওই পোশাকে দেখে সবার বেশ মজা লাগলো। মন খুলে হাসলো সবাই। সব স্টেশনে একই অবস্থা ঘটলো— উচ্চৈঃস্বরে নমস্কার জানিয়ে ডাক্তারজী চলন্ত ট্রেন থেকে সবাইকে বেশ মজার খোরাক জোগালেন। পরিহাস প্রিয় ডাক্তারজীর এমন ঘটনা অনেক আছে। এই ভ্রমণের মধ্যেই তিনি বোম্বাই এলেন। সেখানে তখন 'ইনফ্লুয়েঞ্জার' প্রকোপ। ডাক্তারজীও জ্বরে পড়লেন। বোম্বাইয়ের সঙ্ঘচালক দাদাসাহেব নাইকের বাড়িতে ডাক্তারজীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই পরিবারের সবাই জ্বরে আক্রান্ত। কাশীনাথ পন্থ দেখা করতে এসে তিনিও জ্বরে শয্যা গ্রহণ করলেন। এভাবে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল, কোনো কাজ হচ্ছিল না। ডাক্তারজী তাই এই সপ্তাহের নাম দিলেন 'ইনফ্লুয়েঞ্জা সপ্তাহ'। দু-তিন দিন ডাক্তারজীর খাবার 'হোমলী ক্লাব' থেকে আনানো হলো। একদিন খাবারের সঙ্গে কৌটায় নুন না থাকায় সে কাজে যুক্ত স্বয়ংসেবককে দাদাসাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন। ডাক্তারজী তখন তাকে শান্ত করে বললেন— 'নুন ছাড়া খাওয়া কি থেমে থাকে? মনে রাখবেন, অনেকে খাওয়ার জন্যই বেঁচে থাকে। আবার কিছু লোক বেঁচে থাকার জন্যই খাবার খায়। আমাদেরও বেঁচে থাকার জন্য খেতে হবে'। 'সাধ্য' আর 'সাধনার' নিগূঢ় সম্পর্কের কথা ডাক্তারজীর কথায় যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

(৭৯)

সঙ্ঘ ও সমাজ

তখন দেশের নানা অবস্থায় অনেক সময়ই জনতার পক্ষ থেকে আন্দোলন, সত্যাগ্রহ ইত্যাদির পরিবেশ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এমন নানা সময়ে পূজনীয় ডাক্তারজীকে অনেকবারই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে— 'এই আন্দোলনে সঙ্ঘের ভূমিকা কী থাকবে?' সেবার পুনায় সোন্যামারুতি মন্দিরে মুসলমানদের আব্দারে ঘণ্টা বাজানোর উপর প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করায় হিন্দুদের মধ্যে তীব্র জনরোষ সৃষ্টি হয়। আদেশ জারি হয়েছিল— সোন্যামারুতি মন্দিরের পশ্চিম, দক্ষিণ এবং উত্তরে নব্বই ফুট পর্যন্ত রাস্তার উপরে অথবা কোনো প্রকাশ্য স্থানে এবং লক্ষ্মীপথের উপর তাম্বোলি মসজিদ পর্যন্ত কোনো রকম বাজনা কেউ বাজাতে পারবে না। কারণ ছিল সোন্যামারুতি মন্দিরের ক্ষুদ্র ঘণ্টাধ্বনিতেও মুসলমানদের নাকি নমাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। গত বছরেও এমন হয়েছে, এবার হিন্দু সাধারণ আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো। এই অন্যায় পক্ষপাতিত্বমূলক সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হনুমান জয়ন্তীর শুভদিনে হনুমান মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি করে সত্যাগ্রহ শুরু হলো (১৯৩৯, ২৫ এপ্রিল)। এই সত্যাগ্রহের কারণে পুনা জুড়ে তখন এক উত্তেজনাময় পরিবেশ। ঠিক এই সময় পুনায় সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ চলছিল।

ডাক্তারজী স্বাভাবিকভাবেই সেই দিকের সমস্ত কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ডাক্তারজী জানতেন স্বয়ংসেবকেরা নিজের প্রেরণাতেই এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করবে। তবুও অনেকে এসে প্রশ্ন করল 'এই সত্যাগ্রহে সঙ্ঘ কী করবে?' ডাক্তারজী তখন অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিলেন— 'এই সত্যাগ্রহ সমস্ত নাগরিকদের এবং স্বয়ংসেবকরাও নাগরিক হিসেবে শত শত নাগরিকের সঙ্গে এতে অংশ নিচ্ছে'। একথায় অনেকের মন ভরলো না। তারা চাইছিলেন সঙ্ঘ তার নামে সরাসরি সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করুক। ডাক্তারজী এটাতো চাইতেন যে সঙ্ঘের প্রভাবে সমাজের অনেক কাজ সংঘটিত হোক, কিন্তু তার কৃতিত্ব, শ্রেয় সঙ্ঘ লাভ করবে তিনি তার বিরোধী ছিলেন। এই মানসিকতা থেকেই সংগঠন সমাজ থেকে আলাদা হয়ে আর একটি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি গড়ে তোলে। পরে অবশ্য সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের শেষে ১৩ মে ডাক্তারজী আন্নাসাহেব লিমায়ে, মহাদেব শাস্ত্রী দিবেকর, দত্তোপন্ত আপটে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সত্যাগ্রহ করেন এবং স্বল্প সময়ের জন্য গ্রেপ্তার হন। মামলার সময় ডাক্তারজীর দেওয়া লিখিত বক্তব্যটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি লিখেছিলেন— 'সোন্যামারুতি মন্দির সম্বন্ধে পুনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বাদ্য নিষেধের আদেশ সম্বন্ধে আমি গভীর ভাবে চিন্তা করি। আমার মনে হলো এই আদেশের দরুন আমাদের দেশের যে অপমান করা হয়েছে। তার বিরোধিতা করার আজকের পরিস্থিতিতে এটাই একমাত্র উপায় বলে মনে হওয়ায় এরকম আমি করেছি' এ কাজে ডাক্তারজী প্রমাণ করেছিলেন সমাজ থেকে সঙ্ঘ নিজেকে আলাদা কিছু ভাবে না।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস